Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছিমা বেগম

রোলঃ 23090120101

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছিমা বেগম

রোলঃ 23090120101

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাছিমা বেগম, আইডিঃ 23090120101 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নাছিমা বেগম

আইডিঃ ----------

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1
প্রথম অধ্যায় 2
দাওয়াহ্ পরিচিতি 2
দাওয়াতের পারিভাষিক পরিচয় : 3
দাওয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য 5
দাওয়াতের বিভিন্ন স্তর 7
দাওয়াতের কৌশল 9
দায়ীর গুণাবলী 10
দাওয়াতের গুরুত্বপ্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য 15
দ্বিতীয় অধ্যায় 18
বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত 18
হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ 23
হযরত ইদ্রিস আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াহ 24
হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ 24
হযরত হুদ আলাই সাল্লাম এর দাওয়াহ 26
হযরত সালেহ আঃ এর দাওয়াত 27
হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতেরপদ্ধতি 29
হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ 38
হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ 38
হযরত লুত আলাইহিস সালামের দাওয়াহ 39
হযরত ইয়াকুব আলাইহি সাল্লাম এর দাওয়াহ 40
হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত 40

হযরত মুসা আলাই সালাম এর দাওয়াত..51
হযরত শোয়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ..66
আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব আলাইহি সাল্লাম এর দাওয়াহ........................68
হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দাওয়াত..69
হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াহ 70
হযরত ইলিয়াস আলাইহি সাল্লামেরওয়াদাওয়াত...70
হযরত ইল ইয়াসিন এর দাওয়াহ 71
হযরত আল ইয়াসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াহ.................................71
হযরত উজায়ের আঃ এর দাওয়াহ..72
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দাওয়াহ...72
হযরত জাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াহ 73
হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ্..73
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ্ 75
তৃতীয় অধ্যায় 76
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ্...........................76
মক্কায় ইসলামের দাওয়াত..81
প্রথম নির্দেশ..82
গোপন প্রচার 83
আল কুরআনের প্রভাব 84
আকিদা-বিশ্বাসের সংশোধন 84
গোপন সালাত...85
গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 85
গোপন দাওয়াত কালীন মুমিনদের বৈশিষ্ট্য 85
প্রকাশ্য প্রচার 86

পারিবারিক নিমন্ত্রণ..87

মুসলিম নির্যাতন..89

হযরত বেলাল রাঃ এর উপর নির্যাতন..90

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর নির্যাতন..................................90

হযরত খাব্বাব রাঃ এর উপর নির্যাতন 90

সুহাইব (রা.)-এর ওপর নির্যাতন:..91

হারিস (রা.)-এর শাহাদাত বরণ 91

.ফাতিমা ও সাঈদ (রা.)-এর ওপর নির্যাতন: 92

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর নির্যাতন:..93

হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ:..94

আবিসিনিয়ায় হিজরত..95

প্রলোভন:..95

লবীদের ইসলাম গ্রহণ 96

উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ 96

জিন জাতির ইসলাম গ্রহণ 96

মি'রাজ..97

বায়আতুল আকাবা 98

মদীনায় দাওয়াত..99

দাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র..100

মদীনায় দাওয়াতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 100

বদর যুদ্ধ...100

উহুদ যুদ্ধ..101

বীর মাওনার ঘটনা..101

বুন কায়নুকার যুদ্ধ 102

বনু নাজিরের নির্বাসন......102
আহযাব যুদ্ধ......103
ইসলামের দাওয়াহ সম্বলিত চিঠি প্রেরণ:......103
হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি......105
সম্রাটের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি:......107
দাওয়াতের স্থিতিশীলতা......108
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য:......108
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে মহিলা সাহাবাদের ভূমিকা......117
উপসংহার......118
তথ্যসূত্র:......119

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক ।দরুদ ও সালাম তাঁর রাসূলের প্রতি । আল্লাহর রহমত ও করুন সমস্ত আসহাবে রাসুল সাঃ এর প্রতি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা সুচারুরূপে তাদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি । মানুষ মহান রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুক। জ্ঞান মেধা আর চিন্তার বিচিত্রতায় মানুষ আল্লাহ রাব্বুল অনন্য সৃষ্টি । ১৮ হাজার মাখলুকাতের মধ্যে আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। নবীরা মানুষকে তাদের পরিচিতি কে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করেন। মানুষ নিজেই বুঝে না আল্লাহ পাক তাকে কত দামি মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিচিত্র তাদের চিন্তা , চাওয়া, কার্যকলাপ সবকিছু । এ পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সাধু , গুরু সন্ন্যাসী , গোত্র প্রধানরা , নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের ভক্তি বিশ্বাস কে বলে দিয়েছে । ব্যক্তি পূজা ,মূর্তি পূজা , প্রকৃতি পূজা, ইত্যাদি অহেতুক অনর্থক কাজে ব্যস্ত থেকে, স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে, সম্ভাবনাময় এক দামী জীবনের ইতি টানে । মানুষ তার নিজের জীবনের মূল্যই বুঝতে পারেনা। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে কি তার দায়িত্ব ,কি তার করণীয় ,কিছুই বুঝতে পারে না ।আল্লাহ রাব্বুল ,আলামীন মানবজাতির হেদায়েত ও কামিয়াবির জন্য প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক এলাকার জন্য একের পর এক ধারাবাহিকভাবে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ পুরো বিশ্বের সকল মানুষের জন্য বাঁশির, নাজির ও খাতামুল আম্বিয়া বানিয়ে প্রেরণ করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে। তাকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য একমাত্র দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। শুকরিয়া যিনি আমার মত নালায়েক কে তার দ্বীনের দাওয়াত সম্পর্কে অর্থাৎ "নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল" এমন শিরোনামে কিছু লেখার বা এ ব্যাপারে চিন্তা করার, বিভিন্ন মনীষীদের আলোচনা, লেখা ইত্যাদি নিয়ে একটু চর্চা করার তৌফিক দান করেছেন । মনে হচ্ছে , এ তো আমার গত ফেলে আসা অবহেলায় কাটানো জিন্দেগীর হিসাব এবং ভবিষ্যৎ জীবনের আগত প্রজন্মের জন্য, আমার নিজের জন্য, একটা বড় মাইলস্টোন হতে পারে ।এটা মোটেও একটা সাধারণ বিষয়ের আলোচনা নয়। বিভিন্ন মনীষীদের লেখা থেকে এ সংকলন, যেন আমার নিজের প্রতি দায়িত্বহীনতা, বিশ্বমানবতার প্রতি আমার এবং সবার দায়িত্বহীনতার অমারজনীয় অপরাধের অনুভূতি জাগে । তারপর আত্মসংশোধন ও পুন:যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্তের প্রেরণা জাগ্রত হয় । একই সঙ্গে মানবজাতীও যেন তার দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারে যার শিকার সে হয়েছে , নবীদের দাওয়াতী কর্মকে উপেক্ষা করে । এজন্য নবীদের দাওয়াতি কর্মকে ভালোভাবে আয়ত্ত করে জীবনের একমাত্র কাজ হিসেবে নিতে হবে । নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল এটা

আমাদের পর্যালোচনা করার অপেক্ষা রাখে। এই কথা সত্য যে, মানুষের অবস্থার ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে না , যতক্ষণ না ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আর পরিচ্ছন্নতা না আসে । আর তা একমাত্র সম্ভব নববী চিন্তাধারা , নববী তরিকায়, নবীওয়ালা দাওয়াতের কাজ আবার শুরু করার দ্বারা।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ২৩ বছরের নিরলস চেষ্টা সাধনায় দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের এমন এক জামাত তৈরি করেছেন যারা ছিলেন এই দিনে হকের জিন্দা নমুনা এবং দাওয়াতের হকের প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামের মত দীন ও আখিরাতের এমন বাস্তব নমুনা এবং অবিরাম চেষ্টা সাধনার এমন দৃষ্টিনন্দন আদর্শের আরেকটি দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাস পেশ করতে পারেনি । তারা একমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জামাত ছিলেন । যারা মানব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হিসেবে মানবতার উচ্চ শিখরে আরোহন করে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেছেন । এবং বিশ্বময় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ছড়িয়ে দিয়েছেন, দুনিয়ার আনাচে-কানাচে । দাওয়াত পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হননি ,তাবেঈদের এমন এক জামাত তৈরি করে দিয়েছেন, যারা দীনে হকের প্রচার-প্রসার ও ইসলামের দাওয়াত দূর দূরান্তে পৌঁছে দিতে সামান্য ত্রুটি করেননি। তারা চলে যাওয়ার পরও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রয়েছে। তাদের জামাতে সামিল হতে রয়েছেন তাবে -তাবেইন, উলামা মাশায়েক, সুফিয়া ও আউলিয়া কেরামের জামাত। প্রত্যেক যুগে তারা একনিষ্ঠতার সঙ্গে দীন প্রচারের কাজ করেন এবং নিজের পুরা জীবন এই কাজের জন্য উৎসর্গ করে দেন । দীনের দাওয়াত হকের দাওয়াত। দ্বীনের দাওয়াত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত । এই দাওয়াত একজন মুমিনের আসল সম্পদ । যে সম্পদ তার জীবনের চেয়েও প্রিয়। এই দাওয়াত ,মালিকের বন্দিগির দাওয়াত।

প্রত্যেক নবী এ দাওয়াতের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জামদিয়ে গেছেন।

প্রথম অধ্যায়

দাওয়াহ পরিচিতি

কত মনি , ঋষি, স্রষ্টাকে পাওয়ার আশায় ভুল পথে সমস্ত জীবন কষ্ট করেছে, শত শত মানুষ হিমালয়ের পাদদেশে ধ্যানরত অবস্থায় জীবন লীলা শেষ করেছে। তার কোন হিসাব নেই কিন্তু তারা সত্যের সন্ধান পায়নি। নবীগণ আল্লাহপাকের মননীয় ব্যক্তিত্ব। তারা মানুষকে সত্যিকারের মুক্তির পথ দেখান। নবীদের অবর্তমানে নবীদের হাতে গড়া মানুষেরা পর্যায়ক্রমে আল্লাহপাকের মনোনীত দীনকে বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দাওয়াতের মাধ্যমে হাজারো ফরজ ও সুন্নত জিন্দা হয়। নবীদের অনুসরণে

দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে স্থলভাগের পূর্ব প্রান্তের দেশ ফিজি আইল্যান্ড থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত, উত্তরে নরওয়ে,সুইডেন, ডেনমার্ক সহ সারা পৃথিবীতে দীনের নবজাগরণ শুরু হয়। দাওয়াতি কার্যক্রমে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত নবী রাসুল ও তাদের অনুসারীদের পন্থা এজন্যই আমাদের শেখা ও অনুসরণ করা প্রয়োজন যে এ পদ্ধতিগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন।

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহতালার খলিফা। আল্লাহর হুকুম অনুসারে নিজের জীবন এবং পৃথিবী পরিচালনা করা , মানুষের একমাত্র কর্তব্য। মানুষের অন্যান্য সব কর্তব্য এই একটামাত্র কর্তব্যের আওতাভুক্ত কিন্তু প্রবৃত্তির মোহ ভোগের বাসনা, ক্ষমতার দম্ভ , জীবন ও নিজের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা, মানুষকে এই একমাত্র কর্তব্য পালন থেকে দূরে রাখে। সে নিজেকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ থেকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ, শান্তিও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানের জন্য আল্লাহতালা একমাত্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেন। এবং যুগে যুগে আল্লাহর ঐশী বাণী নিয়ে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরিত হন। এই নবীগণ আল্লাহতায়ালার নির্দেশ ও নির্দশন অনুসারে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। এরই নাম দাওয়াহ।

নবীদের দাওয়াহ দেয়া শুরু হয় আদম আলাইস সাল্লাম এর দুনিয়ায় আগমনের সময় থেকে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর সময় পর্যন্ত।

নবী-রাসূলগণ যেমন দাওয়াত দিয়েছেন, তেমনি তাদের সহচর গণ দাওয়াতের নির্বাচনের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরও দাওয়াতের এ ধারা এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি । হয়তো কম করেছে অথবা যতটা বেগবান হওয়া আবশ্যক ছিল ,তেমনি হয়নি। কিন্তু দাওয়াহ সবসময়ই জারি ছিল ।

দাওয়াতের পারিভাষিক পরিচয় :

পারিভাষিক অর্থে কেবল আহ্বান জানানো কে দাওয়াহ্ বলা হয় না বরং এটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা। যাতে ব্যক্তি বা সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সব প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত, বুদ্ধিদীপ্ত শিল্প বিষয়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা, তা গ্রহণ করা এবং তাদের বাস্তব জীবনের চর্চার জন্য প্রস্তুত করার পদ্ধতিগত সব প্রচেষ্টা যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে দাওয়াহ বলা হয় ।

ইমাম আল গাজ্জালীর মতে- জ্ঞানের প্রতিটি শাখা এ জাতীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হয় এমন কর্মসূচিকে ইসলামে দাওয়াহ্ বলে ।এতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে- আল্লাহর দিকে দাওয়াতের অর্থ হলো, তার প্রতি ঈমান আনা ও তার রাসূলগণ কর্তৃক আনিত বিষয়সমূহের উপর ঈমান আনা ,এইভাবে যে রাসূলগন যা বলেছেন সেগুলোকে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তারা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা।এখানে ঈমান আনার আহ্বান এভাবে যে রাসূলগণ যা বলেছেন সেগুলোকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়া এবং তারা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা।

ডক্টর আহমদ গ্যালুস বলেন,

الدعوات الى الاسلام تعني محا ولدي العمليه والقويه لامال الناس اليه.

অর্থ :মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বাচনিক সব প্রচেষ্টা হল ইসলামী দাওয়াহ।

মোহাম্মদ আল খতিবের মতে, ভালো বা কল্যাণকর কাজ করা এবং মন্দ কাজ বর্জন করা সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা, ভালো কাজের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা সঠিক পথ অনুসরণ করা এবং বাতিল পথ বর্জন করার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচেষ্টার নাম ইসলামী দাওয়াহ।

আব্দুল্লাহ আল আলোরির মতে: ইসলামী দাওয়াহ হল মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞান বুদ্ধিকে এমন আকিদার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো, যা তার উপকারে আসবে এবং এমন কল্যাণকর বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে আনা যা তার কল্যাণ সাধন করবে। মানুষকে সেই পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করা যাতে তারা লিপ্ত হতে যাচ্ছিল ,এমন বিপদ থেকে রক্ষা করা যা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছিল।

ডক্টর রউফ সালাদির মতে: দাওয়াহ হল সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, যে আন্দোলন মানব সমাজকে কুফর থেকে ঈমানে, অন্ধকার থেকে আলোর এবং জীবনের সংকীর্ণতা থেকে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ততায় নিয়ে যায়।তিনি আরো বলেন, কোন সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার পরিবর্তে সঠিক তাওহিদী ধ্যান ধারণা গ্রহণ করার লক্ষ্যে, ব্যাপক জনমত তৈরীর সমন্বিত প্রচেষ্টার নাম ইসলামী দাওয়াৎ। এ সম্পর্কে তার অপর মত হল, কোন সমাজে প্রচলিত জীবনাচার পরিবর্তন করে, ইসলামী জীবন আচার গ্রহণ করার জন্য জনমত গঠনের

প্রতিষ্ঠা হল ইসলামী দাওয়া। যে জীবনাচার আল্লাহর প্রতি ঈমানের উপর এবং যে জীবনাচারের নিয়ম নীতিগুলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রফেসর খাওলির মতে :দাওয়াহ্ হল জাতিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করার নাম। তিনি দাওয়াহকে একটি পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম আবু বকর জাকারিয়ার মতে সুবিজ্ঞ আলেমগণ কর্তৃক তাদের সামর্থ্য অনুসারে মানুষের কাছে ইসলামের আবেদন পৌঁছানো এবং তার শিক্ষা দেয়ার নাম ইসলামের দাওয়াত, যা আল্লাহ প্রদত্ত দীনের ভাষ্য অনুসারে সজ্ঞানে এবং দুনিয়ার জীবনের স্বরূপ সন্ধানে তাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

দাওয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা যেভাবে দাওয়াহ প্রদানের আদেশ প্রদান করেছেন, সেভাবে দাওয়াহ প্রদানের মাধ্যমে

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা দাওয়াতের মূল লক্ষ্য। আল কুরআনের দাওয়াতের বিবরণ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ও তার সাহাবীগণের কর্মনীতি পর্যালোচনা করে ইসলামী চিন্তাবিদগণ দাওয়ার আরো কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। যেমন:

- ইবাদত

আল্লাহ যা করার আদেশ করেছেন তা করা এবং যেগুলো করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকাকে এবাদত বলে। দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য পৃথিবীতে আল্লাহর এবাদত প্রবর্তন করা। কারণ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন

وما خلق جنه والانثى الا ليعبدون;

অর্থ : “আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি”।

- শান্তি প্রতিষ্ঠা

দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে কাম্য বিষয় হল শান্তি । ইসলামী দাওয়াহ তার জীবন ও পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। কারণ মানব জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের মূল লক্ষ্য । দাওয়াহ এ লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে না ।

- দ্বীন প্রতিষ্ঠা

দ্বীন হলো আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলাম দাওয়াতের মূল লক্ষ্য আল্লাহর দ্বীন জীবনের সব পর্যায়ে কায়েম করা। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনে, প্রতিটি স্তরে দ্বীনের হুকুম আহকাম মূলনীতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা ।

- সত্যকে জয়ী করা

ইসলাম সত্য আর পৃথিবীর অবশিষ্ট সব মতবাদ ও ধর্ম মিথ্যা। ইসলামের দাওয়াহ ব্যক্তি ও সমাজকে সত্যের আলোকে উদ্ভাশিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় । এর মাধ্যমে সত্য ধর্ম ইসলামকে জয়ী করা হয়। দাওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণ করে আল্লাহতায়ালা বলেছেন:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله

অর্থাৎ :"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় পুরোপুরি নির্মূল হয় এবং সব ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৯।)

- হেদায়েত লাভ ও প্রদান

দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য নিজে হেদায়েত লাভ করা এবং অন্যকে হেদায়েতের পথে ডকা । ব্যক্তি অন্যকে দাওয়াত প্রদান করতে গেলে আগে নিজেকে দাওয়াতের শিক্ষায় অধিষ্ট রাখতে হয়।

- ইসলামী শিক্ষা প্রচার

ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো, ইসলামিক শিক্ষার প্রচার এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। নবী রাসুলগণের দাওয়াতেরও এ লক্ষ্যই ছিল। ইসলামী শিক্ষা প্রচারের কাজ, স্থান-কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

- ইসলামী শিক্ষা প্রচারের স্বাদ
- প্রশিক্ষণ দান ও দায়ী নির্বাচন
- সামগ্রিক শুদ্ধতা অর্জন
- সমন্বিত উন্নতিসাধন
- খেলাফতের দায়িত্ব পালন
- মুক্তি ও কল্যাণ লাভ
- তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ
- দুনিয়ারকরণীয়সম্পর্কেজ্ঞানলভ
- সুসংবাদদান ও সতর্কীকরণ

- ইবাদতের পদ্ধতি জানা
- গায়েবের জ্ঞান লাভ
- জান্নাত জাহান্নামের জ্ঞান লাভ
- সত্যের পথে আহবান

দাওয়াতের বিভিন্ন স্তর

দাওয়াতের সর্বপ্রথম স্তর আত্মউন্নয়নমূলক দাওয়াহ
অর্থাৎ নিজের উপর চেষ্টা, প্রচেষ্টা, সাধনা।
দায়ী বা দাওয়াত প্রদানকারী তার নিজের পরিশুদ্ধি ও আত্ম উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবে।হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মক্কী জীবনের দাওয়াতের প্রস্তুতি এই প্রকারের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের দাওয়াতের মূল বক্তব্য হলো দাওয়াতের বিষয় সমূহ নিজে মেনে চলা।।নিজের জীবনে দাওয়াতের শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা । কোরআন মজিদে এ দাওয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصره انا ومن اتباعني وسبحان الله وما انا من المشركين

অর্থ :আপনি বলুন এটাই আমার পথ আমি প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত থেকে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান করি। আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আর আল্লাহ মহা পবিত্র। যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে আমি তাদের দলভুক্ত নই ।
(সূরা ইউসুফ :১০৮)

দাওয়াতের দ্বিতীয় স্তর
নিকট আত্মীয়দের থেকে আরম্ভ করা। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদের এরশাদ করেন:

وانذر عشيرتك الاقربين

অর্থাৎ" আপনার নিকট আত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন করুন।" কোরআন মজিদে অন্য আয়াতে এরশাদ করেন:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعسون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

অর্থ: "হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনদেরকে সে আগুন থেকে রক্ষা করো। যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর। যে আগুনের পাহারাদার হবে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী ফেরেশতা গণ। তারা আল্লাহর কোন আদেশের

অবাধ্য হন না বরং তিনি তাদেরকে যে কাজ করার আদেশ করেন তারা তাই করেন। দাওয়া(।সূরা তাহরীম: ৬)

আঞ্চলিক বা গোত্রের দাওয়াত

কোন এলাকা বা গোত্রকে কেন্দ্র করে যে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ বলে। আবার দায়ী যে অঞ্চলে বাস করেন সে অঞ্চলের লোকদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করাকেও আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ বলে । বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর আগে পৃথিবীতে যত নবী রাসুল আগমন করেছেন তারা প্রত্যেকে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াতের কাজে নিবেদিত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মক্কা অঞ্চল ও কোরাইশ গোত্রকে কেন্দ্র করে দাওয়াতের সূচনা করেন। পরবর্তীতে অবশ্য তার দাওয়াহ আরবের সীমানা ছাড়িয়ে পরে ।

আন্তর্জাতিক দাওয়াহ :

যে দাওয়াতের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত থাকে তাকে আন্তর্জাতিক দাওয়া বলে। ইসলাম বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীর সব এলাকার মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা এক শাশ্বত নিয়ামত দান করেছেন । যে কারণে ইসলামের দায়ী গন কোন অঞ্চল, গোত্র, দেশ বা কালের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নন।, বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকর পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এখন যে কোন জায়গা থেকেই বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই প্রেরণ করেছেন। বলেছেন :

قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

অর্থ : “বলুন হে মানুষ! অবশ্যই আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি ।

(সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৮)

অন্যত্র আছে:

وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون

অর্থ: আপনাকে আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা সাবা, আয়াত ২৮)

কুরআনের আরেক জায়গায় বলা হয়েছে:

وما ارسلناك الا رحمه للعالمين

অর্থ: "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"
(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

দাওয়াতের কৌশল

দাওয়াতের ক্ষেত্রে দায়ীর কিছু কৌশল থাকা প্রয়োজন;

1. হেকমত ও প্রজ্ঞা: দায়ীকে স্থান-কাল পাত্রের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে প্রয়োজন নরম আচরণ আর যেখানে প্রয়োজন শক্ত আচরণ করতে হবে। যাতে সত্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার মন গলে যায়। নিয়মিত চেষ্টা করাতে থাকলে আল্লাহ পাক হেকমত ও প্রজ্ঞা দান করেন।

2. মাওয়াইযে হাসানা (উত্তম নসিহত) : শ্রোতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উসুল হল শ্রোতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমনভাবে উপস্থাপনা করা যাতে তার মন তা মেনে নেয়।
3. হৃদয়ভিত্তিক উপস্থাপনা কৌশল,
   - দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম হিকমা হল পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে দাওয়াতে কাজ শুরু করা
   - মানবিকগুণের দিকে প্রশংসা করা।
   - আল্লাতালা তাকে কি কি অনন্য নেয়ামত দান করেছেন, তা উল্লেখ করা।
   - যে বিষয় পছন্দ করে সে বিষয়কে কেন্দ্র করে দাওয়াত দেওয়া।
   - তিনি কষ্ট পান এমন কোন প্রসঙ্গ না তোলা।
   - পূর্ববর্তী নবী, রাসুল, সৎ লোকদের সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করা।
   - দাওয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা কি কি পুরস্কার ও সহযোগিতা প্রদান করবেন অঙ্গীকার করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
   - ব্যক্তির বিপদে অসুবিধায় দয়া দেখানো, কষ্টে অংশ নেওয়া। যে কোন সমস্যায় সহানুভূতি ও মমতা নিয়ে পাশে দাঁড়ানো।
   - ব্যক্তির অভাব দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা, সাহায্য করা এবং বন্ধু রূপে খোঁজখবর নেয়া এবং সম্ভব হলে সেবা করা।
   - ব্যক্তির কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াত পেশ না করে বরং তার কথা শোনা এবং তাকে বলতে দেয়া।

- বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করা ।এতে ব্যক্তি সম্মান বোধ করবে এবং দাওয়াতের প্রতি আগ্রহী হবে।
- উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা,
- দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিষয় বিবেচনা করা মাদউর জন্য এখন কোন বিষয়টি বেশি উপযুক্ত তা দেখা।

উপরোক্ত সবগুলো আম্বিয়া আলাইহিস সালামের দাওয়াতের পদ্ধতি।

দায়ীর গুণাবলী

- এখলাছ

আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন নবীদের, মুসিবত ও ধৈর্যের কথা শুনিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং বিশেষভাবে নিঃস্বার্থ ইখলাসের সঙ্গে দাওয়াতের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক পর্যায়ে বলেছেন আপনি মুশরিকদের কাছে এ-কথার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে দিন-

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

অর্থ:'এরা ছিল ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথে চল এবং তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। এতো হল বিশ্ববাসির জন্য উপদেশ।' (আনআম ৯০)

- তাকওয়াহ ও ইনাবাত ইলাল্লাহ

وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون

আমি তোমাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম,যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা সবর করেছিল, আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ়বিশ্বাসী।(সূরা সেজদা আয়াত ২৪)

- আল্লাহমুখিতা

فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب

অর্থ: এরপর তুমি যখনই ফারেগ হবে, তখনই একান্ত এবাদত করবে এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে। (সূরা ইনশিরা আয়াত ৭-৮)

দায়ীদের জন্য নির্জনে আল্লাহ ও তাঁর জিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করা জরুরী।
"যখন আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত থেকে ফারেগ হবেন তখন অন্য মেহনত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং নামাজ জিকির ও দোয়া ইস্তেগফারে লেগে যান" অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরাম এই আয়াতের এই তাফসীর করেছেন।ক

- সবর ও মহানুভবতা

দাওয়াতের কাজ করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাঃ কে কাফেররা পাগল বলতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে পাগল বলার প্রতিউত্তরে তিনি কাফেরদিগকে কোন শক্ত কথা বলেননি বরং তিনি সবর ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেলল দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের অর্থ তাবলীগের কাজে রত ব্যক্তিদেরও প্রতিপক্ষের গালিগালাজ ও মিথ্যা অপবাদের খারাপ প্রতিউত্তরের পরিবর্তে রাসূল সাঃ এর এই আদর্শ অনুসরণ করা চাই ।
ولا تستغل حسنه ولا السياره ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه كانه ولي حم

অর্থ: ভালো মন্দ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা । ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত
(সূরা হামিম সেজদা আয়াত ৩৪।)

- মানুষের সাথে ক্ষমা ও সহমর্মিতার আচরন

যে ব্যক্তি মানুষের পথপ্রদর্শক হবে, তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ তাকে বিভিন্ন অপবাদ দেয়, বন্ধু রূপে শত্রুতা করে। এসব সত্যেও, সম্পূর্ণ হিম্মত ও সংকল্প নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাকে কাজ করে যেতে হয়। যদি তার গন্তব্য ও পথ সঠিক হয় , তবে অবশ্যই সে কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ।
(মারেফুল কোরআন পৃষ্ঠা ৪৮৮)

দায়ীকে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে সব ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। যাদের মধ্যে যেমন আছে নেককার, ভদ্র মানুষ তেমনি আছে অভদ্র, অশিক্ষিত মানুষ । দায়ীর কর্তব্য সব ধরনের মানুষের সঙ্গেই সদাচার ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেয়া । এমন না হওয়া চাই যে, ভালো মানুষদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে আর খারাপদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে।
خذ العفوه وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

অর্থ: “তুমি ক্ষমা পরায়ণতা, অবলম্বন কর । সৎকাজের আদেশ করো এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো ।”(আরাফ আয়াত ১৯৯)

- মমতা ও নম্রতা

যারা দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে চায়, তাদের কর্তব্য হলো, প্রথমে নিজেকে উত্তম গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত করা। গুণাবলির মধ্যে এই গুণটিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যে, তারা দাওয়াতের কাজে কল্যাণ কামনা ও মমতার আচরণ করবে, চাই তাদের প্রতিপক্ষ যত বড় দামী হোক না কেন। কারণ সব নবীদের মধ্যেই এই গুণ ছিল।এই মমতা ও নম্রতার কারণেই শ্রোতাদের উপর তাদের দাওয়াতের বিশেষ প্রভাব ছিল। যা আমাদের দাওয়াতে নেই। আমাদের দাওয়াতের কাজ নিষ্ফল হওয়ার একটি কারণ হল, আমরা আমাদের প্রতিপক্ষকে সর্বদা নিচু ও ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করি। যাতে অনেক সময় শরীয়তের সীমানা লঙ্ঘন করে গালাগালি, অপবাদ, মিথ্যাচার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতেই আমাদের দাওয়াতের ফলাফল শুন্য হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আয়াতে, দাওয়াতের কাজে নম্রতা, মমতা ও সহমর্মিতা করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

اذهب الى فرعون انه تغاه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى

অর্থ : “তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও। সে অনেক দম্ভ দেখিয়েছে। তাকে গিয়ে নম্র কথা বল, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় পাবে।”
(সুরা তোহা ৪৩-৪৪)

- দ্বীনের দাওয়াত নিয়মতান্ত্রিক দিয়ে যাওয়া

যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি,
এক, দৃঢ়তা।
দুই, নিয়মিত পরিশ্রম।
দাওয়াতে দীনের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য এই দুইটি বিষয় জরুরী। একটা আয়াতের তাফসীরে মুফতি শফি রহমাতুল্লাহি এই বিষয়টি বের করে এনেছেন।

والله قد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

অর্থ: "আমি ধারাবাহিকভাবে তাদের নিকট আমার কথা পাঠাতে রয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, আয়াত ৫১)
আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এটি ছিল যে, তারা হক কথা, নিয়ম তান্ত্রিকভাবে বারবার বলে যেতেন। মানুষের মিথ্যারোপ ও অস্বীকার তাদের কাজের ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটাতে পারত না। তারা একবার না মানলে দ্বিতীয়বার, দ্বিতীয়বার না মানলে তৃতীয়বার, চতুর্থবার এভাবে একের পর এক নিরাবচ্ছিন্নভাবে বলে যেতেন। কারণ কারো অন্তরে বসিয়ে দেওয়া তো আল্লাহতালার কাজ। এতে কোন দায়ী বা কল্যাণকামীর হাত নেই। কিন্তু বারবার বলে যাওয়া তাদের সামর্থ্য ছিল বিধায় তাতে কোন প্রকার ত্রুটি করতেন না । আজকে দাওয়াতের কাজে জড়িতদের এখান থেকে_ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।
(মারেফুল কোরআন খ ৬, পৃষ্ঠা ৬৪১)

- হক কথায় দুর্বলতা প্রদর্শন না করা:

আপনি যেহেতু হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা রয়েছে বাতিলের উপর। অতএব আপনি এই মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করবেন না । যেমনি ভাবে এ পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণ করেননি। তারা আশা করে আপনি আপনার পেশাগত কাজে কিছু শিথিলতা প্রদর্শন করুন (নাউজুবিল্লাহ) তাহলে তারাও আপনার বিরুদ্ধে শিথিল হয়ে যাবে। আপনার শিথিল হওয়ার অর্থ হলো তাদের কে আপনি কিছু বলবেন না, আর তাদের শিথিল হওয়ার অর্থ হলো, তারা আপনার বিরোধিতা করবে না । সূরা কাফিরুনের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ শিথিল হওয়ার এই ব্যাখ্যাই করেছেন -(দুররে মানসুর)

- ভাষাগত পাণ্ডিত্য

মুসা আলাহিসসালাম বললেন, আমার ভাষা তেমন সাবলীল নয় আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশি সাবলীল। সুতরাং তাকেও আমার সাহায্যকারী হিসেবে রিসালাত দান করুন, যাতে সে আমার সত্যায়ন ও পূর্ণ সমর্থন করতে পারে। কারণ আমি আশঙ্কা করছি ফেরাউন আমাকে মিথ্যা বলবে , তার সঙ্গে বিতর্কের প্রয়োজন হতে পারে বিতর্কের জন্য এমন লোকই দরকার।

- দায়ীর লেখা সংক্ষিপ্ত, সর্বমর্মী সাহিত্য পূর্ণ ও প্রভাবশালী হওয়া

قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم' انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থ :"আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে এটা সুলাইমানের নিকট থেকে এবং এটা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।"
(সূরা নামল, ২৯ -৩০) হযরত সোলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদহুদের সঙ্গে কথা বলার পর, রানী বিলকিসের নামে একটি পত্র লিখলেন । (যার বিষয়বস্তু পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে) এবং তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য হুদহুদের হাওয়ালা করলেন। হুদহুদ তার ঠোঁটে করে বিলকিসের সামনে পত্রটি রেখে দিলো। বিলকিস পত্র পড়ে তার পরিষদবর্গকে ডাকলেন। বললেন, হে পরিষদবর্গ ! আমার কাছে একটি পত্র এসেছে, যার বিষয়বস্তু নিতান্তই গুরুগম্ভীর ও সুমহান । কারণ তার ভাষা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও উচ্চ সাহিত্য মানসম্পন্ন। তা এসেছে সোলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। তার প্রথম অংশ হল 'দয়াময় আল্লাহর নামে'।
সোলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মাত্র সংক্ষিপ্ত কয়েকটি লাইনে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। সুউচ্চ সাহিত্যমানও তাতে বজায় রয়েছে। কাফিরের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজের শাহি প্রতিপত্তিও তাতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা এবং অহংকারের উৎস বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত কাতাদা রাঃ বলেন পত্র লিখার ক্ষেত্রে সকল নবীর সুন্নত এটাই যে, পত্র দীর্ঘ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে পত্র থেকে বাদ না করা। (রুহুলমাআনি , মারেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫৭৪)
সংক্ষেপে দায়ীর আরো কিছু গুণাবলী

- দায়ী সর্বদা উম্মতের ফিকির করবে
- সর্বদা পরকালের চিন্তা করবে
- বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না
- অধিক সময় চুপ থাকা
- কঠোর মেজাজি না হওয়া
- আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করা
- দাই দুনিয়ার কোন বিষয়ে রাগ করবে না
- নিজের জন্য রাগান্বিত হবে না
- দায়ের কথা হবে স্পষ্ট
- সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করা
- হক কাজের ত্রুটি না থাকা
- কোন কাজে সীমালঙ্ঘন না করা
- সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা
- উঠতে বসতে আল্লাহ পাকের জিকির করা ইত্যাদি।

দাওয়াতের গুরুত্বপ্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য

আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াহ প্রদান করা অপরিসীম গুরুত্ববহ কাজ। ইসলামে দাওয়াতকে নানা কারণে মুমিনের প্রথম এবং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াহ প্রদান অফুরন্ত সওয়াবের কাজ। এর মাধ্যমে দাঈকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "তারচেয়ে উত্তম কথা আর কার যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং ঘোষণা করে নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম।" (সূরাহামীম-সিজদা:৩৩)

এ পৃথিবীতে মানুষ যে সব কাজ সম্পাদন করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। নবী-রাসূলগণ এ কাজ করার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: "আল্লাহর ইবাদতকরার জন্য এবং আল্লাহ বিরোধী সবকিছুকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।"
-[সূরা নাহল: ৩৬]

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষে নবী-রাসূলগণ দাওয়াতের কাজ করেননি। দাওয়াতের সীমাহীন গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য দাওয়াহ প্রদানকারী দাঈ প্রেরণ করেছেন। যেমন-

إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থ: 'নিশ্চয় আপনি হলেন সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক জাতির জন্যই পাঠির পথের প্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা রা'দ ৭।)
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন।

سُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

অর্থ: "আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"[সূরা নিসা: ১৬৫।

এ ঘোষণা থেকে প্রমাণ হয়, মানব জাতির কাছে দাওয়াতের মর্মবাণী পৌছানোর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন কোনো রকমের মাধ্যমগত ঘাটতি না থাকে, সে কারণে একদিকে প্রতিজন মানুষকে সৃষ্টির সূচনায় তিনি মানুষের কাছ থেকে তাঁর প্রভুত্ব মেনে নেয়ার স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে চূড়ান্ত জবাবদিহিতার জন্য উপস্থিত হওয়ার আগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাকে সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; যাতে করে কেউ কোনোভাবে বলতে না পারে যে, তাকে সতর্ক করা হয়নি বা তাকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে সে অবস্থাতেই বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে।
ইসলামী দাওয়াতের মূল কাজই হলো মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আহ্বান করা; শয়তানের পথ থেকে, ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির পথ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কাজের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন:
"যে ব্যক্তি মানুষকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করবে সে হিদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সমান নেকী পাবে। এতে হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নেকীতে সামান্যতম ঘাটতিও করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গুমরাহির পথে আহ্বান করবে সে ব্যক্তিকে গুমরাহির অনুসারী ব্যক্তির সমান গুনাহ পাবে। এতে গুমরাহ লোকদের গুনাহে কোনো কম করা হবে না।"
(সহীহ মুসলিম,সুনানেতিরমিযী ও আবু দাউদ

ইসলামী দাওয়াহ একান্তভাবে পুণ্য ও ভালো কাজের প্রতি দাওয়াত। এ কাজে অংশ নিলে দাঈ পুণ্য ও ভালো কাজের অংশ পাবে। মন্দ কাজে আহ্বানকারীর মতো মন্দ ফল ভোগ করবে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রতিযোগিতামূলকভাবে মুমিনদেরকে সৎ কাজে অংশ নেয়ার এবং অসৎ কাজে অংশ না নেয়ার আদেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ: "ভালো কাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না।" [সূরা মায়িদা: ২১
রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতের মর্যাদা উল্লেখ করে বলেছেন,
لغدوة فى سبيل الله او روح في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

অর্থ: "আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজে একটি সকাল ও সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া এক দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)
অন্যত্র তিনি বলেছেন:
"আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোনো হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে ব্যক্তি শ্রোতার চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী ও জ্ঞানী হয়ে থাকে।" (সুনানে তিরমিযী)
বিষয়টির গুরুত্ব সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সমকালীন জীবনযাত্রার একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অর্থ: "আল্লাহর কসম। যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উট কুরবানী করার চেয়েও বেশি মর্যাদাকর হবে।"- (সুনানে আবু দাউদ)

উল্লেখ্য, এ সময়ে আরবে লাল উট মহামূল্যবান এবং উচ্চ সম্মানের প্রতীক হিসেবে গণ্য ছিল।
দাওয়াতের অসীম গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা সব দেশে, সব সময় দাওয়াহ প্রদানকে আবশ্যিক করেছেন। বিষয়গত গুরুত্বের কারণে বিদায় হজের ভাষণেও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বলেছেন:

فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ

অর্থ: "কাজেই যারা উপস্থিত রয়েছে তারা যেন যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে আমার দাওয়াহ পৌঁছে দেয়।" (সুনানে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই নির্দেশের পর আরাফাহ ময়দানে উপস্থিত সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ সাহাবী ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের অনেকেই আর স্বদেশে ফিরে আসেননি। ঐতিহাসিকগণ এ প্রেক্ষাপটেই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ২০ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে মক্কা-মদীনায়। বাকি সবাই শুয়ে আছেন মক্কা-মদীনার বাইরে বিভিন্ন দেশে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে।

দাওয়াহ প্রদান মুসলিম উম্মাহর জন্য তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত

পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের পথে পরিচালনার জন্য, গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সত্য ও সুন্দরের শাশ্বত জ্ঞান দিয়ে আল্লাহতালা অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় নবী ও রাসুলগণের সংখ্যা এক লাখ ২৪ হাজার বা ২ লাখ ২৪ হাজার। সংখ্যা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও এবং হওয়া সম্ভব না হলেও এটি ধারণা করা যায় সহজেই, আল্লাহতালা পৃথিবীতে অগণিত নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। কারণ তিনি প্রতিটি জাতির কাছে নবী প্রেরণ করার কথা যেমন বলেছেন তেমনি সতর্ক না করে সঠিক পথ না দেখিয়ে কাউকে শাস্তি না দেয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন
বলেছেন,

ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

অর্থাৎ" আল্লাহর এবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।",

(সূরা নাহল আয়াত ৩৬।)
ولكل امه الرسول
অর্থাৎ “প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রাসূল ছিলেন।(সূরা ইউনুস আয়াত ৪৭)

পৃথিবীতে মানুষের অগণিত জাতি এবং ঐতিহাসিক প্রাগৈতিহাসিক দীর্ঘ জীবনযাত্রার কথা বিবেচনা করলে সহজেই অনুমিত হয় যে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট সংখ্যাতেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন কিন্তু কোরআন মজিদে সব নবী রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়নি করা সম্ভবও ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন

ورسلا قد قصصنهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

অর্থাৎ” আমি অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের অনেকের কথা আগে আপনাকে আমি বলেছি আর প্রেরণ করেছি। অনেক রাসুল যাদের কথা আমি আপনাকে বলিনি।
”(সূরা নিসা ১৬৪।)

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم القصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

“আর অবশ্যই আমি আপনার আগেও অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি ,আমি তাদের কারো কারো কথা আপনার কাছে বলেছি , কারো কারো কথা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি । (সূরা মুমিন আয়াত ৭৮)

কোরআন মাজিদে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ব্যতীত আর মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলেন,

1. হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম
2. হযরত ইদ্রিস আলাইহি ওয়াসাল্লাম
3. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম
4. হযরত হুদ আলাইহিস সালাম
5. হযরত সালেহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম
6. হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম
7. হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম
8. হযরত ইসহাক আলাইহিস সাল্লাম
9. হযরত লুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম
10. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লাম
11. হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম
12. হযরত শোয়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লাম
13. হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম

14. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম
15. হযরত হারুন আলাইহিস সালাম
16. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম
17. হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম
18. হযরত ইলিয়াস আলাইহি ওয়াসাল্লাম
19. হযরত ইলইয়াসিন আলাইহিওয়াসাল্লাম
20. হযরত আল ইয়াসাআ আলাইহিওয়াসাল্লাম
21. হযরত উজাইরা আলাইহিস সালাম
22. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম
23. হযরত জাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম
24. হযরত ইয়াহিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম
25. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

এবং নাম উল্লেখ না করে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে আরও দুইজন নবীর । এরা হলেন, হযরত সামাউন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খিজির আলাইহিস সালাম । এরা ছাড়া কুরআন মসজিদে আরও চারজন পূর্ণবান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে । এরা নবী কিনা বা নবী নন কিনা, সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। এরা হলেন,

1. হযরত লোকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
2. হযরত জুলকারনাইন আলাইহিস সালাম।
3. হযরত জুলকিফল আঃ এবং
4. হযরত মারিয়াম আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

হাদিসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এইসব নবী-রাসূলগণের দাওয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে সব আলোচনা প্রাসঙ্গিক কোনো ঘটনার ভিত্তিতে বা বিশেষ কোনো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুবিন্যস্ত ভাবে ইতিহাস বর্ণনা বা জীবনী তুলে ধরার লক্ষ্যে কোথাও ধারাবাহিক বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় । কুরআন মজিদ ও হাদিসের এসব বর্ণনার আলোকে নিম্নে নবী-রাসূলগণের দাওয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল কোরআন ও হাদিসে নবীগণের দাওয়াহ প্রসঙ্গ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার এক বাণীতে ইসলামী দাওয়াহ বিকাশের এই ধারা দুটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন । তিনি বলেছেন -

كانت قومي اسرائيل توسهم الانبياء كلمه هلك نبي خليفه نبيا وانه لا نبي بعد وتكون خليفه

অর্থাৎ "ইসরাইল জাতির নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর নবীগণ । যখন কোন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন নতুন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবে না। হবে কেবল খলিফা ।" (সহিহ বুখারী, ,হাদিসুল আম্বিয়া অধ্যায়)

আল্লাহর নির্দেশ ও নির্দেশনায় নবী-রাসূলগণ দাওয়াতের নবুয়তী ধারার বিকাশ ঘটান - যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। শেষ নবী আগমন পূর্বকালে, নবী রাসূলগণের ইন্তেকালের পর, পরবর্তী নবী-রাসূল আগমন না করা পর্যন্ত নবীর অনুসারীগণ দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সে সময়ে এরকম অবস্থা খুব কমই হয়েছে, কারণ রাসুল -পূর্বকালে ,পূর্ববর্তী নবী রাসুল ইন্তেকালের আগেই পরবর্তী নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন , অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাছে সমসাময়িক কালে একাধিক নবী রাসুল এসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামের আগমনের মাধ্যমে নবী রাসূল আবির্ভাবের ধারা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার ইন্তেকালের পর দাওয়াহ বিকশিত হয়েছে - তার অনুসারীগণের মাধ্যমে। আল্লাহর নবী রাসূলগণ প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে ইসলামী দাওয়াতের কাজে নিজেদেরকে নিরন্তর সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং দাওয়াতের ধারাকে উৎপত্তির ধারা থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতার ধারায় নিয়ে গেছেন । কোরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদের জন্য যে দ্বীনকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যে দীনের আদেশ তিনি নূহ আলাইহিস সাল্লাম আলাইকে দিয়েছিলেন, যে ওহী আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, সে দীন আমি ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসার কাছে ও প্রেরণ করেছিলাম । এই বলে যে, তোমরা আমার দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে কোন মতভেদ করো না।

(সূরা শূরা আয়াত ১৩)

অন্যান্য বিষয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বলতে যে রকম ধারাবাহিকতা ও কার্যক্রমের কথা বুঝানো হয় , ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না । কারণ মৌলিক দিক থেকে ইসলামে 'দাওয়াত' - হযরত আদম আলাই সাল্লাম এর সময় যেমন ছিল, হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সময় এসেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি । প্রত্যেক নবী- রাসুল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে উপজীব্য করে প্রদান করেছেন । নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী কার্য পর্যালোচনা করলে এবং তাদের দাওয়াহ সম্পর্কে কোরআন মাজিদের বর্ণনা বিশ্লেষণ করলেও বিষয়টি একান্ত ভাবে প্রমাণ হয়।

আম্বিয়ায় কেরাম আলাইহিস সালাম ইসলাম বিরোধীদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কর্মধারা অনুসরণ করতেন। নবীদের আগমন সবসময় এমন যুগে হয়েছিল, যখন সত্যদীনের অবস্থা পুরোপুরি এলোমেলো অবস্থায় ছিল এবং জাহিলিয়াত সমাজকে গ্রাস করেছিল। অবস্থার এমন বিপর্যয়ের মধ্যে যেসব মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে একটি নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ গঠিত হতে পারে, নবীগণ প্রথমে সেসব বিষয়ের উপর মেহনত করেন। সব দেশের, সব সময়ে, সমস্ত নবীগণের আমলে এর মৌলিক বিষয় ছিল তিনটি-

1. আল্লাহ তালার একত্ববাদের প্রতি ঈমান
2. রিসালাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনুগত্য সহকারে
3. আখেরাতে প্রতি ঈমান

পূর্ণ জিম্মাদারী সহকারে এই তিনটি বিষয়ের বিশ্বাস যখন বিকৃতি হয় তখন সমাজ জাহেলিয়াতের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে ।যখন এগুলোর মধ্যে বিকৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন পুরো সমাজের উপর জাহেলিয়াতের অন্ধকার প্রবলভাবে চেপে বসে। আবার এই তিনটি জিনিস উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ইসলামের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে আর সমাজ পুরোপুরি ভাবে দিনের আলোর মধ্যে চলে আসে। কাজে যেভাবে হোক যে উপায়েই হোক ইসলাম বিরোধীদের কাছে ইসলামকে সুনির্দিষ্ট ভাবে এই তিনটি বিষয়ের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। আম্বিয়া কেরাম দাওয়াতের জন্য কোন একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করেননি বরং যে গতিতে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকে সে অনুসারে তাদের প্রচার ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছেন।

সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে যখন লেখাপড়ার কৌশল আবিষ্কৃত হয়নি, লেখা পড়ার কৌশলের পরিবর্তে মৌখিকভাবে দাওয়াহ পরিচালনা করেছেন। নেক কাজ ও সত্যবাদীতার নানা বিষয় তারা মুখে মুখে শিখিয়েছেন এবং আবশ্যক বিষয়বস্তুগুলো মুখস্ত করিয়ে দিয়েছেন। বংশপরম্পরায় এসব শিক্ষা প্রশিক্ষণ একজন থেকে অপরজনের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। একপর্যায়ে যখন তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বা নিজেদের বক্তব্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একে বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তখন আবার নতুন দাওয়াহ সহ নতুন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি দ্বীনি দাওয়াহকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পাত্র বিবেচনায় নতুনভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন। লেখাপড়ার কৌশল উদ্ভাবনের পর দাওয়াতের একটি নতুন পদ্ধতি

বের হল। লিখিত অবস্থায় আল্লাহর বাণী এলো, লিখিতভাবেই সেগুলো সংরক্ষণ করা হলো । হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় লিখে সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ৪২ জন বা এর বেশি সংখ্যক লোককে নিয়োগ করা হলো। কাজেই বুঝা যায়,এটা কোন গতিহীন নিষ্প্রাণ পদ্ধতি নয়। ।মানবজাতির মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যেও পরিবর্তন এবং উন্নতি হতে থাকে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজের উপায়, উপকরণ এবং জানার মাধ্যমেও পরিবৃদ্ধি ঘটেছে। হকের আহ্বানকারীগণই এ থেকে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক লাভবান হবার অধিকারী। নবীদের কর্মনীতি সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ

পৃথিবীতে আগমনের দীর্ঘদিন পর হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রী হাওয়া আলাই সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তারা মানবজাতির বংশবৃদ্ধির সূচনা করেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রথম মানুষ ছিলেন এবং সন্তানদের উপর তার প্রবল প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে দাওয়াতের কাজে তিনি কোন বাধার সম্মুখীন হননি । তবে তিনি যে তাওহীদ,আখেরাত এবং বিশেষভাবে সহনশীলতার দাওয়াত প্রদান করেছিলেন , তা হাবিলের ভাষ্য থেকে জানা যায়। হাবিল তার বিপথগামী ভাই কাবিলকে বলেন,

قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين

অর্থাৎ হাবিল বলল: আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত করো, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত তুলবো না। কেননা আমি তো সুনিশ্চিত ভাবেই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি । (সূরা মায়েদা, ২৭-২৮)
বলাবাহুল্য যে, হযরত আদম আলাই সালাম এর পুত্র হাবিল এই শিক্ষা তার পিতার দাওয়াহ থেকেই লাভ করেছেন।

হযরত ইদ্রিস আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াহ

হযরত ইদ্রিস আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত নুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতার দাদা ছিলেন । এমনও বলা হয় তিনি হযরত নূহ আলাইহিস সালামেরই দাদা ছিলেন। বাইবেলে তাকে ‘ইনক’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে । তবে বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে কোরআন মাজিদের বর্ণনায় কোন মিল নেই। তার সম্পর্কে কুরআন মজিদে আল্লাহতালা বলেছেন,

واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا

অর্থাৎ “এই কিতাবে উল্লিখিত ইদ্রিসের ঘটনা উল্লেখ করুন । নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী । আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।”(সূরা মারিয়াম ৫৬-৫৭)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন;

واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين

“ ইসমাইল ইদ্রিস ও জুলকিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই সৎকর্মশীল ছিলেন।”
(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৫)

হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্থান অঞ্চলে হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন । তিনি দীর্ঘ ৯৫০ বৎসর দাওয়াতের কাজ করেন । তিনি আল্লাহর প্রথম রাসূল ,এমন একটি কথা প্রচলিত রয়েছে । তাকে দ্বিতীয় আদম ও বলা হয় । কোরআন মাজিদে তার নামে একটি সূরা রয়েছে। (৭১ তম সূরা) তার দাওয়াতী কাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন

- ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم

অর্থাৎ : “আমি নূহকে , তার জাতির কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তার জাতিকে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী , যেন তোমরা আল্লাহ

ছাড়া আর কারো এবাদত না করো। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি ।”(সূরা সূরা হুদ আয়াত ২৫-২৬)

قال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نذنكم كاذبين، قال يا قومي ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، انلزمكموها وانتم لها كارهون، ويا قوم لا اسالكم عليه مالا من اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا، انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون

অর্থাৎ : নূহের জাতির কাফের নেতারা বলল , আমরা তো আপনাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখছি না , আমরা তো দেখছি আমাদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে অথর্ব ও অধম , তারা ছাড়া আর কেউ আপনার অনুসরণ করে না। আমরা তো আমাদের উপর আপনার কোন শ্রেষ্ঠ তো দেখছি না বরং আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। তিনি বললেন , ‘হে আমার জাতি তোমরা আমাকে বলো , যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, যদি আমার প্রতিপালক তার পক্ষ থেকে আমাকে অনুগ্রহ দান করেন , তার পরও তোমরা যদি সে বিষয়ে অন্ধ থাক, তাহলে আমি কি তখন তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি, যখন তোমরা তা অপছন্দ কর ? হে আমার জাতি ! দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ-সম্পদ কামনা করি না। আমার পুরস্কার আছে আল্লাহ তায়লার কাছে। যারা ঈমান এনেছে আমি তো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না । নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে । অথচ আমি দেখছি , তোমরা হলে একটি মূর্খ জাতি।’

(সূরা হুদ ,আয়াত ২৭-২৯)

হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতেরস জবাবে তার জালিম জাতি বলেছিল:

قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين

অর্থাৎ : তারা বলল - তুমি যদি তোমার দ্বীন প্রচারের এ কাজ থেকে বিরত না হও , তাহলে তুমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে মৃতদের একজন হবে।

(সূরা শু’য়ারা,আয়াত ১১৬)

বিরোধীদের বাধা , হুমকি এবং নির্যাতনকে উপেক্ষা করে হযরত নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রেখেছেন । তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশক্রমে যে ধারাক্রম অনুসরণ করেছেন , কোরআন মজিদের সূরা নূহে এর বর্ণনা রয়েছে । তাকে উদ্ধৃত করে আল্লাহতালা বলেছেন ;

قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبر استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم إسرارا

অর্থাৎ : "নুহু বলেছিলেন - হে আমার প্রতিপালক ! নিশ্চয়ই আমি আমার জাতিকে রাতে ডেকেছি, দিনে ডেকেছি, কিন্তু আমার আহবান কেবল তাদের পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে আঙ্গুল দেয়। নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে, জেদ করে এবং চরম অহংকার করতে থাকে। এরপর অবশ্যই আমি প্রকাশ্যে তাদেরকে আহবান করেছি, পরে আমি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছি এবং গোপনে উপদেশ দিয়েছি।

(সূরা নূর আয়াত ৫-৯)

হযরত নুহ আলাই সাল্লাম এর দাওয়াহ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতেরা হাজির হবেন । আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন , তুমি কি পৌঁছিয়েছো ? তিনি জবাব দিবেন, হা, হে পরওয়ারদেগার । তখন আল্লাহ তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন নুহু কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছে ? তারা বলবে: না, আমাদের কাছে কোন নবীই আসেননি । এরপর আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? নূহ আলাইহি সাল্লাম বলবেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মাহ।তখন আমরা সাক্ষ্য দিব যে, নিশ্চয় তিনি পৌঁছিয়েছেন । আর এটি আল্লাহ তাআলার বাণীর তাৎপর্য যে, এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি, যেন তোমরা গোটা মানবজাতির উপর সাক্ষ্যদাতা হতে পারো। - (সহিহ বুখারী)

হযরত হুদ আলাই সাল্লাম এর দাওয়াহ

প্রাচীন আরবের প্রভাবশালী জাতি 'আদ' এর কাছে আল্লাহ তায়ালা হুদ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। 'আদ' ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের চতুর্থ উত্তরপুরুষ । তার পূর্ণ নাম আদ ইবনে আউস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ। উত্তরে পারস্য উপসাগর অববাহিকায় অবস্থিত ওমান ও দক্ষিণে লোহিত সাগর প্রান্তের হাজরা মাউতন ও ইয়েমেন পর্যন্ত এলাকায় তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ২০০ বছরের অধিককাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা চার দেবতার পূজা করত। এরা হলো বৃষ্টিদায়ীনি সাকিয়া , স্বাস্থ্যদায়ীনি সালিমা, বিপদতারিনী হাফিজা এবং অন্যদায়ীনি রাজিকা । কাজের জন্য তারা জল সেঁচের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল । তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল নিপীড়নকারী । তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল।

প্রথমে তিন বছর দুর্ভিক্ষ দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয় কিন্তু তারা এতে কর্ণপাত করেনি। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয় । তাদের কাছে প্রেরিত হয়ে হযরত হুদ আলাইহিস সাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। কুরআন মসজিদে তার দাওয়াতের বিবরণ দিয়ে আল্লাহতালা বলেন :

والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون، يا قوم لا اسالكم عليه اجرا، من اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

অর্থাৎ ; "আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রচনাকারী । হে আমার জাতি !আমি এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইনা । আমার পারিশ্রমিক আছে তার কাছে, ,যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তবুও বুঝবে না । হে আমার জাতি তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও । এরপর তার কাছে ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য বিপুল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন । কাজেই তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"
(সূরা হুদ ৫০-৫২)

হযরত সালেহ আঃ এর দাওয়াত

প্রাচীন আরবের একটি অন্যতম প্রভাবশালী জাতি ছিল সামুদ। হযরত সালেহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । সামুদ ছিল আদের চাচাতো ভাই। হযরত নূহ আলাইহি সাল্লামের পুত্র শ্যামের দুই পুত্র ছিল, ইরাম ও আবির। আবিরের পুত্র ছিল সামুদ, আর আদ ছিল ইরামের পুত্র । আদ সম্প্রদায়ের দুইশত বছর পর সামুদ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা দক্ষিণ সিরিয়া থেকে উত্তর আরব সীমান্ত পর্যন্ত ভু ভাগের অধিকর্তা ছিলেন । ওয়াদিউল কুরা ও আল হিজর অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম হিজরীতে হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোমানদের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযানেবেরিয়েছিলেন তখন তিনি সামুদের এলাকা ওয়াদিুল কুরা অতিক্রমের সময় দ্রুত সে স্থান পেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।
সম্প্রতিক খনন কার্যের মাধ্যমে আবিষ্কৃত পেটরা নগরীর অবস্থান প্রমাণ করে যে, নাবাতিয়ানরা এর অধিপতি ছিল এবং তারা সামুদ সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল । সামুদ সম্প্রদায়

তাদের আগের জ্ঞাতি ‘আধ’ সম্প্রদায়ের মতো দাম্বিক ও অত্যাচারী ছিল। পানি ও চারণ ভূমিতে তারা সাধারণ মানুষের অধিকার সমভাবে স্বীকার করত না। এজন্য তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে একটি উটনি প্রদান করেন । তাদেরকে বলা হয় তারা যেন এটিকে আল্লাহর জমিনে বাধাহীন ভাবে খেতে দেয় এবং কোন ক্ষতি সাধন না করে । কিন্তু তারা তা অমান্য করে এবং উটনী কে হত্যা করে ফেলে । ফলে আল্লাহর গজবে তারা ধ্বংস হয়ে যায় । এর আগে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করে পাপাচার ও অনাচারে ডুবে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা দয়া পরশ হয়ে হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন । তিনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন তার দাওয়াতের উল্লেখ করে আল্লাহতালা বলেন :

والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم
اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب

অর্থাৎ” আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ কে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন । কাজেই তোমরা তার কাছে ক্ষমা চাও। আর তার কাছেই প্রত্যাবর্তন কর । নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক কাছে, তিনি আহবানে সারা দেন।”
(সূরা হুদ আয়াত ৬১)

তার জাতি এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করলেও তিনি দাওয়াহ অব্যাহত রাখেন। কোরআন মজিদে প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে,:

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب, قال يا قومي ارايتم ان كنتم على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير, ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

অর্থাৎ “তারা বলল হে সালেহ! এর আগে তুমি ছিলে আমাদের আশা ভরসার কেন্দ্র। এখন তুমি কি আমাদেরকে তাদের এবাদত করতে নিষেধ করছো, যাদের এবাদত করতো আমাদের পূর্বপুরুষগণ।তুমি যে বিষয়ের প্রতি আমাদের ডাকছো অবশ্যই সে ব্যাপারে আমরা বিভ্রান্তি ও সন্দেহের মধ্যে আছি। তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার রবের প্রেরিত স্পষ্ট

প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তার নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? আমি যদি তার অবাধ্যতা করি । কাজেই তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতি বাড়িয়ে দিচ্ছ। হে আমার জাতি: এটা আল্লাহর উটনি ,তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ।একে আল্লাহর জমিনে বিচরণ করে খেতে দাও। একে কোন কষ্ট দিও না । কষ্ট দিলে তোমাদের উপর সহসাই শাস্তি আপতিত হবে।"

(সূরা হুদ, আয়াত ৬২ -৬৪)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতেরপদ্ধতি

আধুনিক ইরাকের অন্তর্গত ব্যবিলন শহরের 'উর' নামক স্থানে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য ফিলিস্তিন গমন করেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম। আরবের অধিকাংশ আরব যার বংশধর । তার দ্বিতীয় পুত্র হলেন হযরত ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বনি ইসরাইল এবং এ জাতির সব নবীগণ তার বংশধর। কোরআন মজিদের হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এর নামে একটি পূর্ণ সূরা রয়েছে । এছাড়াও অন্যান্য সূরাতেও নানা প্রসঙ্গে তার কথা আলোচিত হয়েছে। হযরত নুহ আলাই সাল্লাম এর পরে পৃথিবীর সব মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হন হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি যখন প্রেরিত হন, তখন ইরাকের উর নগরে নমরুদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাতিল শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পারিপার্শ্বিক কারণে হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমত নিজে বিভিন্নভাবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। তিনি দীনের দাওয়াহ শুরু করেন তার পিতার কাছে দাওয়াহ পেশার মাধ্যমে। কোরআন মজিদে তার দাওয়াতের বিবরণ দিয়ে আল্লাহতালা বলেন

واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما آلهه، اني اراك وقومك في ضلال مبين

অর্থাৎ "স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন ইব্রাহিম তার পিতা আজর কে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন? আমি তো অবশ্যই আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।" (সূরা আনআম ৭৪)

وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض
وليكون من الموقنين

“এভাবে আমি ইব্রাহিমকে আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করিয়েছি যাতে তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।”
(সূরা আনাম আয়াত ৭৫)

فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين

অর্থাৎ রাতের অন্ধকার যখন ইব্রাহিমকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি নক্ষত্র দেখলেন। তিনি বললেন এই তো আমার প্রতিপালক। এরপর নক্ষত্র যখন ডুবে গেল তিনি বললেন, যে ডুবে যায় তাকে আমি ভালোবাসি না।
(সূরা আনআম ৭৬)

فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين

অর্থ “এরপর যখন তিনি জোসনা ভরা চাঁদকে দেখতে পেলেন বললেন, এই তো আমার প্রতিপালক। যখন চাঁদ ডুবে গেল তখন তিনি বললেন, আমাকে আমার প্রতিপালক সঠিক পথ না দেখালে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হব ।
(সূরা আনআম আয়াত ৭৭)

فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما قفلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون

অর্থ :তারপর যখন তিনি উজ্জ্বল সূর্যকে দেখলেন বললেন এটি আমার প্রতিপালক এটি বৃহত্তম এরপর যখন সূর্য ডুবে গেল তিনি বললেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যাদেরকে শরিক করো তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই ।”
(সূরা আনআম, আয়াত ৭৮)

পবিত্র কুরআনে আমরা তার দাওয়াতের দুটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। উক্ত দৃষ্টান্ত দুটি সামনে রেখে উভয়টির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দাওয়াতের প্রধান উপাদান হিকমত ও প্রজ্ঞা । কত সুন্দরভাবে তার দাওয়াতে ফুটে উঠেছে এবং নববি দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র কি চমৎকারভাবে তার দাওয়াত পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে । একটি হলো পিতার প্রতি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত প্রদানকালীন এবং অপরটি হল যখন তিনি তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ উভয় ক্ষেত্রে তিনি অসীম হেকমত ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। পিতার

প্রতি দাওয়াত কালীন তার প্রদত্ত বক্তব্য, অতঃপর জাতির উদ্দেশ্যে তার বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করলে উভয়টির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني عهدك صراط سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

অর্থ :স্মরণ করো এই কিতাবে উল্লেখিত ইব্রাহিমের কথা। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা ! আপনি কেন এমন বস্তুর এবাদত করেন যে শোনে না , দেখেনা এবং আপনার কোন কাজেই আসেনা। হে আমার পিতা ! আমার কাছে তো এমন ইলম এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি । সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন । আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো । হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করছি, আপনাকে দয়াময় এর শাস্তি স্পর্শ করবে এবং আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু। (সুরা মরিয়ম, আয়াত ৪১ - ৪৫)

উপরোক্ত আয়াত
থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পিতাকে দাওয়াত প্রদানে হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কি সুন্দরভাবে পিতার আবেগপূর্ণ স্নেহকে জাগিয়ে তুলেছেন। يا ابتي সম্বোধনটির প্রতি লক্ষ্য করুন।আমার বাপ,আমার আব্বাজান, আমার বাবা ,এর সম্বোধনে পুত্র হওয়ার সৌভাগজ্ঞানুভূতি ভালোবাসা ও বিনয় - নম্রতা পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছে। এ জাতীয় সম্বোধনের মর্ম উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন রুচি বোধের। বস্তুত আল্লাহ যাদেরকে আল কোরআনের ভাষা দান করেছেন যারা এ ভাষার নিগুরতম ভাব ও মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম। তাদের সম্পর্কে বলা হয় তারা যখন আল্লাহর শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত উচ্চারণ করেন তখন তাদের কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। ভয়ে চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। আর যখন জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত, আল্লাহর রহমত সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তখন তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় এবং কোমলতা পরিলক্ষিত হয়, কোন সন্তান যখন আমার বাবা, আমার আব্বাজান, বলে সম্বোধন করে তখন সে মূলত তার আবেগময় পিতৃস্নেহকেই জাগিয়ে তোলে । যদি দায়ীর ভাষায় অহংকারের সাথে বলতেন ,জনাব শুনুন অথবা হে সম্মানিত পুরোহিত, চিন্তা করুন (হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আজর উপাসনালয়ের সম্মানিত পুরোহিত ছিলেন) তাহলে অবস্থা ভিন্ন রূপ হত বরং তিনি সম্বোধন করলেন আব্বাজান বলে

এবং তিনি বুঝে শুনে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই সম্বোধনের এ পন্থা গ্রহণ করলেন, যেন তার কথা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়। কোন পিতা সন্তানের প্রতি যতই নির্মম হোক না কেন, সন্তানের আব্বা সম্মোধন সোনা মাত্রই তার হৃদয় বিগলিত হয়ে তার কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতাকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে ঈমানী আবেগের পূর্বে পিতৃস্নেহের সুপ্ত তার গুলো ছুঁয়ে দিলেন। কারণ দেখা যায় অনেক সময় ঈমানের পূর্বে মহব্বত ও ভালোবাসা অন্তরে আসন গেড়ে বসে। এটা বিচিত্র নয় যে এক ব্যক্তি স্নেহশীল পিতা তো বটে কিন্তু মুমিন নয়। তার স্নেহের ভালোবাসার লাইন সক্রিয় এবং ঈমানের লাইন নিষ্ক্রিয় । তাই এ ধরনের ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে হলে তার হৃদয়ের মনি কোঠায়, সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে, যা উন্মুক্ত রয়েছে। হেকমত ও প্রজ্ঞার মহান নেয়ামত লাভে ধন্য একজন দায়ী ও মুবাল্লীগ কখনো এই দিকটি উপেক্ষা করতে পারে না। এ দিকটি উপেক্ষা করা হলে দায়ী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দাওয়াতি কার্যক্রম ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দায়ী এবং মুবাল্লিগ রুক্ষ মেজাজের হলে সফলতা আশা করা যায় না।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

“যদি তুমি সূক্ষ্ম ও কঠোর চিত্ত হতে, تذيض তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়তো।
(সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৫৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যখন চরম প্রতিকূল অবস্থায় চাচা আবু তালেবকে দাওয়াত দিতে চাইলেন তখন চাচাজান يا عمي
বলে সম্বোধন করেছিলেন, এটা সেই মুহূর্তে, যখন আবু তালেব ইসলাম সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন এবং পুরুষদের পক্ষ থেকে বয়কটের আশঙ্কা করছিলেন। নবী করিম সাঃ তাকে সম্বোধন করে বললেন :

يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يا ساري على ان اترك هذا الامر حتى يزهره الله اهلك دونه ما تركته

চাচাজান, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাঁ হাতে চাঁদ দিয়েও বলে যে, তুমি এই কাজ পরিত্যাগ করো, তবু আমি ত্যাগ করবো না। যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা বিজয়ী করেন এবং আমি তার জন্য নিঃশেষ হয়ে যাই।

পথের উপর অবিচল থেকে এই করুন ও কোমল ভাষা প্রয়োগের ফলাফল এই হল যে, আবু তালেবের মধ্যে স্নেহ ও মানবিক জোয়ার উথলে উঠলো এবং পূর্বপুরুষদের দীনের উপর অবিচল থাকা সত্ত্বেও তিনি বলে উঠলেন ,
আমার প্রিয় বৎস ! যাও তুমি তোমার কাজ করতে থাকো এবং যা খুশি বলো, আল্লাহর কসম তোমাকে আমি কারো হাতে ছেড়ে দিব না।

পিতার সাথে কথোপকথনে হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বিতর্ক ও যুক্তির আশ্রয় নেননি । এমন ভাষাও প্রয়োগ করেননি, যা শুধুমাত্র তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন বিদ্বান শ্রেণীর লোকই বুঝতে পারে বরং দৈনন্দিন জীবনের প্রচলিত ও সাদামাঠা কথা দিয়ে বক্তব্যের সূচনা করলেন, যা একটি শিশু ও বুঝতে সক্ষম। আর বাস্তবেও ছিল তাই । কারণ তার পিতা বয়সের দিক থেকে পরিপক্ক হলেও ভ্রান্ত চিন্তা ও বুদ্ধির অপরিপক্কতা তার তখনও কাটেনি । তাই হযরত ইব্রাহিম আঃ বললেন , আব্বাজান আপনি কেন এমন বস্তুর এবাদত করেন, যে শোনে না , দেখে না এবং কোন উপকারে আসে না। আমার কাছে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, যা সম্পর্কে আপনার জানা নাই । বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান-গরিমায় পুত্র পিতার চেয়ে অগ্রগামী হওয়া একজন পিতার জন্য আনন্দের বিষয় , এতে বিস্ময় কিংবা আশ্চর্যের কিছু নেই । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে , পিতা নিরেট মূর্খ অথচ পুত্র পড়ালেখায় বড় বিদ্বান ও জ্ঞানী, কিংবা পিতা অল্প শিক্ষিত এবং পুত্র জ্ঞান , গড়িমায় পিতার চেয়ে অগ্রগামী। তাই হযরত ইব্রাহিম আলাই সালাম বললেন , আব্বাজান আমার কাছে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, যা সম্পর্কে আপনার জানা নাই। অতএব আমাকে অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। আব্বাজান, শয়তানের আনুগত্য ত্যাগ করুন ।শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। তিনি জানতেন যে মূর্তি ও প্রতিমা তৈরিকে পেশারুপে গ্রহণ করার মত নির্বুদ্ধিতার কাজ যে করতে পারে , তার কাছে কোন সারগর্ভ ও সত্যি কোন কথা বুঝতে পারার আশা করা নিষ্ফল। তাই তাকে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করলেন যে, ইবলিশের সবচেয়ে বড় অপরাধ, সে রহমানুর রাহিম এর অবাধ্য । সব শেষে বললেন আব্বাজান, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে আপনার উপর দয়াময় আল্লাহর শাস্তি আপতিত না হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আপনি ইবলিশের দলভুক্ত হয়ে যান।
স্বীয় জাতির প্রতি দাওয়াত এবং মানব প্রকৃতি ও জড় বস্তুর আলোচনা
জাতিকে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি অবাক শৈলী এমন ছিল
আল্লাহ তাআলা বলেন,
واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون
“তাদের নিকট ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর ।সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায় কে বলেছিল , তোমরা কিসের এবাদত কর ? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং

আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর পূজায় নিরত থাকবো ইব্রাহিম আঃ বললেন তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি তোমার প্রার্থনা শুনে অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে। (সূরা শু'আরা আয়াত,69-73)

উপরোক্ত আয়াত সমূহে হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের আল্লাহ প্রদত্ত দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার জাতির ভ্রান্ত উপাস্য গুলোকে কোন নিন্দা করলেন না এবং সেগুলোকে কোন খারাপ নামে উল্লেখ করলেন না । যদি এমন করতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা ফিরে যেত এবং সূচনাতেই তার বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত হত না । তাই হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম নিজে বলার পরিবর্তে তাদেরকে বাধ্য করলেন, তারাই বলুক তারা কিসের পূজা করছে। তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর পূজায় নিরত থাকবো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম এখানে কোন যুক্তি কিংবা দার্শনিক বিতর্কের অবতারণা করেননি। শুধু এই প্রশ্ন রাখলেন যে, তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো, তারা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায় ? উপকার বা অপকার করতে পারে ? কারণ এ দুটি মৌলিক বিষয়ের উপরে মানব জীবন প্রতিষ্ঠিত । মানুষকে যখন ডাকা হয় তখন সে শুনে, অতঃপর তার কাছে লাভের আশাবাদ, ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় ।এ দুটি এমন বিষয় যার সাথে প্রতিটি মানুষের জীবন সম্পৃক্ত। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির ও সমাজের সাথে সমাজের সম্পর্কের যোগসূত্রই বস্তুত 'উপকারে আসা ও অপকারের আশঙ্কা।' এ দুটি মৌলিক বিষয়। মানুষের সমগ্র জীবন এই মৌলিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون

অর্থ:তারা বলল (তাদের সাথে আমাদের উপকার ও অপকারের আবার কি সম্পর্ক) বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এমন করতে দেখেছি ।
এই কথাটি হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তাদের মুখ থেকে বের করতে চেয়েছিলেন। কারণ এ জবাব মূলত তাদের মূর্খতা ও অক্ষমতারই স্বীকারোক্তি । কোন যথার্থ জবাব দানের ক্ষমতা তাদের ছিল না অর্থাৎ কাল্পনিক মাবুদ সমুহের জন্য আমরা যে সমস্ত নাম নির্ধারণ করেছি সেগুলোর আবার অস্তিত্ব কোথায় ? এগুলো তো হাতে তৈরি পাথরের উপর দন্ডায়মান কতগুলো মূর্তি মাত্র। তাদের এ কাল্পনিক মনগড়া ও অস্তিত্বহীন মাবুদসমূহের, মানুষের জীবনের সাথে কি সম্পর্ক ? মানুষের জন্য তাদের কি করার আছে ? কারো উপকার অপকার বা কাউকে বিপদ হতে মুক্তি দানের ক্ষমতা তাদের কোথায় ? সুতরাং এমন অবাস্তব ও কাল্পনিক বস্তু নিয়ে যুক্তি নির্ভর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অবকাশ কোথায়? উপরের আয়াত

থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মহান নবী হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি উপলব্ধির কি পরিমান গভীরতা দান করেছিলেন।হৃদয় ও চিন্তার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা এবং সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার কেমন দক্ষতা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল । তার জাতির মন ও মগজে সংরক্ষিত কথাগুলো তিনি কি সূক্ষ্ম কৌশলে বের করে ফেললেন । তাদের মেধা বাকশক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সবই প্রকাশ পেয়ে গেল এবং পরিশেষে তাদের তূনীর শেষ তীরটিও তিনি বের করে ছাড়লেন।

(بل وجدنا ابا انا كذلك يفعلون)

কথা হল, “আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কে এমন করতে দেখেছি।” হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যেন তাদের মুখ থেকেই জবাবটি বের করে তাদের তূনির খালি করে তাদেরকে দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়লেন। যেন বলার মত তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর তিনি দাওয়াতের সূচনা করলেন এবং প্রথমে তাওহীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন-

افر أيتم ما كنتم تعبدون. انتم وابائكم الاقدمون فانه عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين

অর্থ : ইব্রাহিম বলল, তোমরা কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যার পূজা করছো তোমরা এবং তোমাদের বিগত পূর্বপুরুষেরা ? তারা সকলেই আমার শত্রু । জগৎ সমূহের প্রতিপালক ছাড়া। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, তিনি আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয় এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনি আমাকে রোগ মুক্ত করেন এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন এবং আশা করি কেয়ামত দিবসে তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।
(সূরা -শুয়ারা ,আয়াত ৭৫ -৮২)

“আমরা মূর্তি পূজা করি এবং তার উপর নিরত থাকবো” জাতির এই উত্তর শুনে হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন, তারা কি তোমাদের ডাক শুনে, যখন তোমরা তাদেরকে ডাকো ,তারা কি তোমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করে? তার বক্তব্যে নেতিবাচক আলোচনায় সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাআলার আলোচনা ও দাওয়াত

প্রসঙ্গ আসার সাথে সাথে তিনি বক্তব্যের গতি পরিবর্তন করে আল্লাহর ইতিবাচক সিফাতসমূহের ব্যাপক আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন । এরশাদ হচ্ছে :

فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلق لي فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميدني ثم يحين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين

"তারা সকলেই আমার শত্রু।জগতসমূহের প্রতিপালক ছাড়া । যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন , তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয় এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনি আমাকে রোগ মুক্ত করেন এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন , অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন এবং আশা করি কেয়ামত দিবসে তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন ।

(সূরা শুয়ারা আয়াত 77- 82)

এ আয়াত সমূহে সৃষ্টি করা, পথপ্রদর্শন করা, রিজিক দান করা, রোগ মুক্ত করা এবং জীবন-মৃত্যু দানের ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার -এ পাঁচটি সিফাতের উল্লেখ করা হয়েছে অথচ মূর্তি সমূহ সম্পর্কে যখন তিনি প্রশ্ন করলেন তখন মাত্র দুটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

এক- তারা কি প্রার্থনা শুনে ? দুই -কোন উপকার বা অপকার করতে সক্ষম?

কিন্তু যখন আল্লাহর নাম এলো, তার প্রসঙ্গ শুরু হলো ,তখন যেন তার হৃদয় আন্দোলিত হয়ে উঠলো । আল্লাহ প্রেমে আত্মহারা হয়ে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে তিনি তার সিফাতসমূহ বলে চললেন। স্বভাবগতভাবেই মানুষ যখন কোন বস্তুতে সাধ অনুভব করে তা খাদ্যদ্রব্য জাতীয় হলে দীর্ঘক্ষণ সেটা মুখে রাখে এবং জিব্বা ও মুখ কে অতিরিক্ত আস্বাদন গ্রহণের সুযোগ দেয় কিন্তু যদি কোন তিক্ত বস্তু হয় অথচ তা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয় তখন যত দ্রুত সম্ভব তা থেকে নিস্তার লাভ করতে চায় এবং এক চুমুকেই বা এক রাশেই তার গলাধঃকরণ করে ফেলে।

অনুরূপ তিনি যখন আল্লাহর নাম উল্লেখ করলেন, তখন তার মধ্যে তীব্র ঈমানী উদ্দীপনা সৃষ্টি হল এবং বলতে লাগলেন , তোমাদের এই মাবুদ সমূহ আমার শত্রু , তবে হা বিশ্বজগতের প্রতিপালক, মহান আল্লাহ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন এবং যিনি আমাকে আহার্যদান করেন এবং রোগাক্রান্ত হলে আরোগ্য দেন এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃ

পর পুনর্জীবিত করবেন এবং যার কাছে আমার আশা যে কেয়ামত দিবসে তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

এতোটুকু বলেও তিনি পরিতৃপ্ত হলেন না , আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারিত হতেই তার হৃদয় আপ্লুত হয়ে উঠলো। স্থান ও কালের পরোয়া না করে তার হৃদয়ের আওয়াজ দোয়ায়ে পরিণত হয়ে বেরিয়ে এলো

رب هب لي حكما والحقني بالصالحين- واجعل لي لسان صدق في الاخرين- واجعلني من ورثه جنة النعيم

"হে আমার প্রতিপালক আমাকে ইলম ও হিকমত দান করুন এবং সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পরবর্তীদের জন্য যশস্বী রাখুন এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (সূরা -শু ,য়ারা আয়াত ৮৩ ৮৫)

এবার স্বীয় পিতার কথা মনে পড়ে গেল কারণ সে ছিল মন্দিরের বিশিষ্ট পুরোহিত এবং প্রতিমা পূজারীদের নেতা ।তাই বললেন :

ولا تخزني يوم يبعثون- يوم لا ينفع مال ولا -بنون الا من اتى الله بقلب سليم

"এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিবসে, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কিছু কাজে আসবে না। সেদিন ওই ব্যক্তি শুধু উপকৃত হবে, যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

-(সূরা শুয়ারা আয়াত ৮৩ - ৮৫)

ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين- شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم- واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين

"নিঃসন্দেহে ইব্রাহিম ছিল মানবজাতির নেতা আল্লাহর অনুগত ও একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না সে ছিল আল্লাহর নেয়ামত সমূহের জন্য কৃতজ্ঞ । আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন। দুনিয়াতে আমি তাকে কল্যাণ দান করেছি এবং পরকালের হবে সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।
(সূরা -নাহল আয়াত ১২০- ১২২)

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইব্রাহিম খলিল আলাইহিস সালামের বড় ছেলে।আরবের কোরাইশ বংশ এবং হিজাযের অধিকাংশ আরব তার অধস্তন পুরুষ । তার বংশে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় মক্কায় তিনি দ্বিতীয় প্রজন্মের বসতি গড়ে তোলেন। এ সময় কাবা ঘর পূর্ণ নির্মিত হয়, হজ প্রবর্তন করা হয় । কাবা নির্মাণে তিনি পিতাকে সহযোগিতা করেন । তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী এবং আল্লাহর নবী ও রাসুল ছিলেন। ।(সূরা মারিয়াম আয়াত ৫৪)

তার কৈশোরে তিনি পিতার দেখা স্বপ্নের অনুকূলে নিজেকে জবেহ করার অনুমতি প্রদান করেন । পরবর্তীতে এ মহান ত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা কোরবানির বিধান প্রবর্তন করেন। হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আরবে দ্বিতীয় প্রজন্মের বসতি স্থাপিত হয় বলে তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা । তার বংশধরদের মধ্যে তিনি তাওহীদ রিসালাত, আখেরাতের নীতিতে দাওয়াতী কাজ করেন। এ কাজে তিনি প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছেন এমন জানা যায় না তবে মরুভূমিতে কঠিন আবহাওয়া ও কঠিন জীবন প্রণালীর মধ্যে তার দাওয়াতের সহজ ছিল এমন নয় । তিনি পারিপার্শ্বিক সব প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করেই দাওয়াতকে আঞ্জাম দিয়েছেন।

হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ

জ্যোতি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এর ছোট ছেলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রী ছাড়ার বৃদ্ধ বয়সে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম লাভ করেন তিনি ফিলিস্তিনে হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এর কর্মভূমিতে দিনের দাওয়া প্রদান করেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছিলেন তার ছেলে বনী ইসরাঈল জাতি এবং এ জাতিতে জন্মগ্রহণকারী সব নবী ও রাসুল তার বংশধর ছিলেন তার সম্পর্কে আল্লাহতালা বলেছেন :وباركنا عليه وعلى اسحاق

অর্থ: আমি ইব্রাহিমকে বরকত দিয়েছিলাম এবং ইসহাককেও বরকত দিয়েছিলাম।
(সূরা সাফফাত ১১৩)

দাওয়াতে দীনের কাজে তিনিও অমানুষিক পরিশ্রম করেন । তবে হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি পরিবেশে দাওয়াতি কাজ করার জন্য তাকে বাতিল পক্ষের প্রতিরোধের শিকার হতে হয়েছে কম বা হয়নি।

হযরত লুত আলাইহিস সালামের দাওয়াহ

হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর ভাইয়ের ছেলে । আল্লাহ তাকে এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, যারা সমকামিতায় অভ্যস্ত ছিল । হযরত লুত আলাইহিস সাল্লাম ভয়ংকর পাপে লিপ্ত এ সম্প্রদায়কে অবিরাম দাওওয়াহ প্রদান করে হেদায়েতের পথে আনার চেষ্টা করেন । কিন্তু তার দাওয়াহ সফল হয়নি । কোরআন মজিদে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার সম্প্রদায় ও দাওয়াতের কথা বর্ণিত হয়েছে ।যেমন:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

অর্থ : “আমি লুতকেও তার জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম তিনি তার জাতিকে বলেছিলেন তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ তোমাদের আগে পৃথিবীর কেউ কখনোই যা করেনি “ (সূরা আরাফ আয়াত ৮০)

লুত আলাইহিস সালাম এর জাতি তাঁর দাওয়া গ্রহণ করেনি । উল্টা তাকে এবং তার অল্প কয়েকজন অনুসারী কে দেশ থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোরআন মজিদে আছে-

وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من
قريتكم انهم اناس يتطهرون

অর্থ : “লুত আলাইহিস সালাম এর জাতি এর কোন জবাব দিল না। তারা শুধু বলল , লুয ও তার অনুসারীদের তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও। তারা তো অবশ্যই এমন লোক, যারা অত্যন্ত পবিত্র থাকতে চায়।”(সূরা আরাফ আয়াত ৪2)

فانجيناه وأهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত লুত আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের রক্ষা করেন। তবে তার স্ত্রীকে রক্ষা করা হয়নি। কারণ সে অপরাধীদের সমর্থন করেছিল চূড়ান্তভাবে। হযরত লুত আলাইহিস সালামের এ সমকামী সম্প্রদায়কে শেষ পর্যন্ত আল্লাহতালা পাথর বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন আমি লুত এর জাতির সমকামী লোকদের উপর ভয়ংকর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম লক্ষ্য করে দেখুন পাপাচারীদের পরিণতি কত ভয়ংকর হয়েছিল। (সূরা আরাফ আয়াত ৮৪)

হযরত ইয়াকুব আলাইহি সাল্লাম এর দাওয়াহ

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ঈসহাক আলাইহিস সালাম এর পুত্র এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৌত্র। তার ওপর নাম ছিল ইসরাইল । এবং তার বংশধর গন প্রত্যক্ষভাবে বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত । তিনি জেরুজালেমের ৩০ মাইল উত্তরে কেনানে বসবাস করতেন । বর্তমানে এর নাম নাবলুস।ফিলিস্তিনে হযরত ইব্রাহিম ও ঈসা আঃ সালামের কর্মভূমিতেই দীনের দাওয়াহ প্রদান করেন । শেষ জীবনে তিনি হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফিলিস্তিন থেকে মিশরে গমন করেন। ফিলিস্তিনে তিনি দাওয়াহ প্রদান করেন। সন্তানদের প্রতি তিনি যে নসিহত করেছেন তা থেকে তার দাওয়াহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ।
আল কোরআনে রয়েছে

ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسلمون

অর্থ :''ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের বলেছেন ,হে আমার সন্তানেরা ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করেছেন তাই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না ।''

(সূরা বাকারা আয়াত ১৩২)

হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত

হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর পুত্র এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রপৌত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লাম এর

চারজন স্ত্রী ছিলেন প্রথম স্ত্রীর গর্ভে তার দশটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে বৃদ্ধ বয়সে তার চতুর্থ স্ত্রী রাহেলার গর্ভে হযরত ইউসুফ ও বিন ইয়ামিন বা ঞ্জামিন জন্মগ্রহণ করেন ইচ্ছা বসত ইউসুফের বৈমাত্রেয় 10 ভাই কৈশোরে তাকে কেনানের বর্তমান নাভলুষ একটি কুপে ফেলে দেয় তার নামে কোরআন মজিদের 12 তম সূরা নামকরণ করা হয় তার জীবন কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঘটনা ক্রমে তিনি মিশর আসতে বাধ্য হন এবং তার মাধ্যমে ইসরাইল জাতি মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী এলাকা ছিল মিশর। আল্লাহতালা তাকে মিশরে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা ঘটনা শেষে তিনি মিশরে উপনীত হয়েছিলেন । সেখানে তিনি আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন। হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত দাওয়াত প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ ।

ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين- قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون- واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون- يا صاحبي السجن ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار- ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون- يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان

“এবং তার সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল তাদের একজন বলল আমি স্বপ্ন দেখলাম আমি আঙ্গুর নিঙ দিয়ে রস বের করছি” এবং অপরজন বলল “আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে আমাদেরকে তুমি এ স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দাও আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।”

ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব । আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিখিয়েছেন তা হতে বলব ।যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে আমি তাদের মতবাদ ত্যাগ করেছি । আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি । আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করা আমাদের কাজ নয় । আমাদের প্রতিপালক এবং সমস্ত মানুষের প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে কারা সঙ্গীদয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক

শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ। তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের এবাদত করছ । যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা নির্ধারণ করেছ। এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারোর এবাদত না করার। ইহাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবগত নয় । হে কারা সঙ্গী দয়! তোমাদের একজনের স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে সে তার প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং অপরজনের স্বপ্নের তাৎপর্য হলো সে শুলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি আহার করবে ।যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছো তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ।

(সূরা- ইউসুফ আয়াত 36-42)

এক দুর্লভ মুহূর্তে হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত

উল্লেখিত আয়াতগুলো বিশ্লেষণের পূর্বে হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকালীন অস্বাভাবিক মুহূর্ত ও প্রেক্ষাপটের একটি চিত্র সামনে রাখা প্রয়োজন । প্রথমে দেখার বিষয় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লাম কেছিলেন।তিনিহলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ওরসজাত পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের পৌত্র এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রোপুত্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন।

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم

"তিনি হলেন এক মহাসম্মানিত নবী মহাসম্মানিত নবীর পুত্র মহাসম্মানিত নবীর পৌত্র এবং মহাসম্মানিত নবীর প্রোপৌত্র।"পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ মর্যাদায় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন নবুয়তের মহান মর্যাদা মারেফাতে এলাহী এবং উন্নত আদর্শ ও পুতপবিত্র চরিত্র মাধুরী তিনি বংশানুক্রমে প্রাপ্ত।

আল্লাহর কিতাব সমূহে তার আলোচনা বিশেষ স্থান পেয়েছে । বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সমূহে তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছ। বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয় । সৃষ্টিকর্তা তার মধ্যে দৈহিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্য যেমন তার কোন তুলনা ছিল না তেমনি উন্নত চরিত্র মাধুরী ও মহৎ কর্মে ছিলেন তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র। দৈহিক ও চারিত্রিক রূপ সৌন্দর্য এবং জ্ঞানের তিনি ছিলেন মিলন কেন্দ্র। উপরন্তু স্বভাবের নম্রতা , চেতনা ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা এবং সহজাত আভিজাত্য তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন সার্বিক অপূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যে যেন পূর্ণিমার চাঁদ। যা তার বাহ্যিক উজ্জলের পাশাপাশি স্বভাব চরিত্র, চালচলন কথাবার্তা ও বুদ্ধি চিন্তা

সবকিছুতেই ফুটে উঠতো। উল্লেখিত আয়াত সমূহের সাহিত্যগত ও অলংকারিক স্বাদ গ্রহণের পূর্বে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দাওয়াতকালীন বিশেষ অবস্থা ও প্রেক্ষাপট সামনে আসে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলির দিকে লক্ষ্য করি।

وجاءت سياره فارسلوا وارضاهم فادلى دلوه

"(ওই কুয়ার নিকট) একদল কাফেলা এল ,তারা তাদের সাকিকে পানির জন্য প্রেরণ করল ,সে তার পানির ঢোল (কুয়ায়) ফেলল"।(ইউসুফ- আয়াত ১৯)

ثم بدى له من بعد ما راء الايه لا يسجننه حتى حين

"নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও তারা স্থির করল যে কিছুকালের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করতেই হবে ।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত -৩৫)
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এক মিথ্যার ভিত্তিতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন । আল্লাহ তাকে তার থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন । মোটকথা এক মিথ্যা অভিযোগের কারণে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লাম কে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো । কারাগারে উপরওয়ালাদের নির্দেশই শুধু কার্যকর করা হয় । সাধারণ কর্মচারীদের সেখানে নেয় অন্যায় ভেদাভেদ করার সুযোগ কোথায়?তাদের দায়িত্ব কেবল কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের নিজ হেফাজতে নিয়ে আসা । যেমন ডাকযোগে প্রেরিত চিঠি আমরা দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করে থাকি। তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ডাক বহনকারী সম্পূর্ণ অজ্ঞ ।অথচ তাতে থাকতে পারে আকস্মিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কোনো বার্তা বা দুঃসংবাদ বাহী কোন খবর।মোটকথা কারারক্ষীরা কয়েদিদের সাথে জড় বস্তুর নেয় আচরণ করে থাকে ।তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠ নিক্ষেপ করল । হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরিচয় বংশ মর্যাদা ও উন্নত চরিত্র মাধুরী জানার তাদের কি প্রয়োজন ? তাদের দেখার বিষয় হল সে একজন কারা দন্ডপ্রাপ্ত আসামি। অন্য কয়েদিদের ন্যায় তাকেও কারারুদ্ধ করাই তাদের কাজ । তার যথার্থ ফয়সালা যখন কারাগারের বাইরেই হয়নি , তখন কারা অভ্যন্তরে আর তার অবকাশ কোথায়?জেলখানার প্রধান লৌহ ফটোক বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ভিতরে বড় ছোট , সম্মান, অসম্মানির কোন ভেদাভেদ নেই । বাইরের মুক্ত পরিবেশ ও নির্মল বায়ু থেকে সেখানে সকলে বঞ্চিত। ফলে সেখানে কয়েদিদের পারস্পরিক কথাবার্তা সুযোগের শেষ নেই।

তিনি সম্মান ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

কারাগারে উচু উঁচু বড় ছোটর কোন ব্যবধান নেই ।এতদসত্বেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লাম অল্প দিনেই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হলেন । সমগ্র জেলখানায় তারা অভিজাত্য ও মহৎ গুণের ব্যাপক আলোচনা শুরু হলো। উন্নত চরিত্র মাধুরী ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গুন তার চারপাশে আচ্ছন্ন । আত্মমানিশার অবসান ঘটালো তার গাম্ভীর্য ,মাহাত্ম্য উন্নত মনোবল , অনুপম চরিত্র কর্মে ,নিপুনতা ,বিনয় ,নম্রতা ,প্রফুল্ল চিত্ততা এবং সকলের সাথে সুন্দর ও শিষ্টাচার মূলক আচরণ। এসবগুলো বৈশিষ্ট্যই অন্তরে প্রভাব সৃষ্টিতে অব্যর্থ। ফলে সকল কয়েদী অবলীলায় তার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো ।গোটা জেলখানায় তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে পরিণত হলেন। আর এ সবই ছিল মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের পূর্ব নিদর্শন। দুইজন কয়েদি সচরাচর স্বপ্নের ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ অদ্ভুত প্রকৃতির দুটি স্বপ্ন দেখল। একজন দেখলো ,সে আঙ্গুর চিপে রস বের করছে। এ স্বপ্ন দেখে পেরেশান ও অস্থির হয়ে গেল স্বপ্নের কোন তাৎপর্যই তার মনে হচ্ছিল না অপরজন দেখলো তার মাথায় রুটি বহন করছে এবং এবং পাখিরা তা হতে থাকছে ।এটাও আরেক অদ্ভুত ও আশ্চর্য স্বপ্ন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য আল্লাহ তাদের অন্তরে হযরত ইউসুফ ইসলামের কথা ঢেলে দিলেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হওয়ার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাদের সহজাত প্রকৃতি ও বাস্তবতা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। বস্তুত জ্ঞান ও যুক্তির পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও বাস্তবদর্শিতার উপর নির্ভর করা মানুষের সহজাত প্রকৃতি।

যাহোক তাদের একজন বলল, আমি নিজেকে আঙ্গুর চেপে মদ তৈরি করতে দেখলাম ,অপরজন বলল আমি দেখলাম যে আমি মাথায় রুটি বহন করছি আর পাখিরা তা হতে খাচ্ছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এ স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দিন আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ন হিসেবে জানি।

আগন্তুক কয়েদি দল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে বলেছিল, আমরা তো আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ হিসেবে জানি ।এখানে এহসানের অর্থ কি হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তো এমন কোন গুপ্তধনের অধিকারী ছিলেন না, যা তিনি কারাগারে বসে কয়েদিদের মাঝে বন্টন করতেন। যদিও এহসান শব্দ শুনে মাত্র সকলের মানষপটে এটাই প্রথম ভেসে উঠে । তার তখনকার অবস্থার বিচারে এ অর্থটি শুধু যুক্তিবিরোধী নয় অসম্ভব বটে । মূলত এহসান এর অর্থ কোন কাজ সর্বোত্তম পন্থায় পূর্ণাঙ্গ রূপে সম্পাদন করা । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন।

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

এহসান হল এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করা, যেন তুমি তাকে দেখছ। কারণ তুমি যদিও তাকে না দেখো , তিনি তো অবশ্যই তোমাকে দেখেন। সুতরাং এখানে এহসান এর অর্থ হল আমরা আপনাকে আল্লাহর এবাদত ও তার আনুগত্য প্রকাশে এহসানের সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম কারী রূপে দেখছি। কথাবার্তা আদান-প্রদান আচরণ, উচ্চারণ তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে এমন মহৎ আদর্শ লক্ষ্য করছি ,যা এহসানের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কেন্দ্র করে অপবাদ ও অভিযোগের অন্ধকার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ছিলেন পূর্নিমার চাঁদের ন্যায়। তাই তাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অপবাদ ও অভিযোগের অবস্থাকে পূর্ণিমার চাঁদের চারপাশে পরিদৃষ্ট অন্ধকারের পরিমণ্ডল কারাগারে তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের সন্দেহ সংশয় প্রকাশ এবং তার চর্চা শুরু হলে কেউ বলল ,তাহলে সে কারাগারে কেন ? কারো মন্তব্য- নিশ্চয়ই সে অপরাধী ।আবার কেউ বলল , কিছুতেই এটা তার থেকে ঘটতে পারে না কিন্তু অচিরেই সকল সন্দেহ সংশয় ও মিথ্যা অপবাদের অপারেশন ঘটলো এবং তিনি তার মহৎ আদর্শ ও নির্মল চরিত্র গুনে সকলের পরম শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও প্রশংসার পাত্রে পরিণত হলেন।

ভীতিকর স্বপ্নের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বুঝতে বাকি থাকলো না যে উল্লেখিত ভীতিকর স্বপ্নই এদেরকে তার শরণাপন্ন হতে বাধ্য করেছে এজাতীয় স্বপ্ন কি ।এরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাপকাঠি এবং জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে শান্তি অশান্তি সফলতা ও ব্যর্থতা ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বলে এদের বিশ্বাস। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম নিয়ন্ত্রিত বিচক্ষণ ও অন্তর দৃষ্টির মহান নেয়ামত আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন রিসালাতো আল্লাহর বাণী ধারণের উপযোগী করে আল্লাহ তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে গড়ে তুলেছিলেন সুতরাং তার কাছে এটা স্পষ্ট যে যে মহাসত্য ও বাস্তবতা থেকে এরা বিস্মৃত হয়ে আছে তা তাদের উল্লেখিত স্বপ্ন থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই মহা সত্য হল মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাস যাতে শিরক ও পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন থাকবে না।

ওই দুই কারা বন্ধুদের কাছে স্বপ্নে তাৎপর্য জানাই ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রয়োজনীয় তাই তাদের কাছে ছিল প্রকট সুতরাং তা বিস্মিত হয়ে যাওয়া বা বিস্মিত করে দেওয়া সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্বভাব ও প্রকৃতিতে ও মানব কল্যাণের যে অনুভূতি দান করেছিলেন তার দাবি হলো তাদেরকে সত্যিকার বিপদ হতে উদ্ধার করে এমন হিতুপদেশ দান করা যা তাদের জন্য সার্বিক কল্যাণ

বয়ে আনবে বিশেষত উপদেশ গ্রহণের জন্য যখন তাদের মন মানুষ সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং অতি নগণ্য কারণে হলেও যখন তাদের বিবেক ও চিন্তায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।
যাহোক উপদেশ দানের এটা এক মোক্ষম সুযোগ যা পুনর্বার নাও আসতে পারে তাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম এমন সুযোগ হাতছাড়া করাকে সঙ্গত মনে করলেন না তাদের উর্বর মন-মানুষে এক উত্তম বীজ বপন করে দেয়া সমীচীন মনে করলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেখার সুযোগ তাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখার এক সুবর্ণ ক্ষেত্রে তৈরি করে দিল। এ সুযোগেই তাদের দিন ও তাওহীদের প্রতি আহবান করতে হবে নির্ভেজাল ও নিরঙ্কুশ তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য তাদের সুষ্ঠু ও সহজে প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

চমৎকার পন্থায় আলোচনার সুযোগ

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য নিয়ে যে কি চমৎকার পন্থায় হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা সুত্রপাত করলেন যেকোনো উন্নত বিষয়ে আলোচনার জন্য তার পদ্ধতি ও উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয় বাক রীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম অন্যথায় বক্তব্যের সৌন্দর্যই বিলীন হয়ে যায় যেমন পূর্ণ অট্টালিকার জন্য তার সিংহ দার ও সুরম্ম ও জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া আবশ্যক যেন তা দেখামাত্রই অট্টালিকার গুরুত্ব অনুগত হয় এবং তাতে প্রবেশে সুখ ও আনন্দ বোধ হয়।
সুতরাং প্রথমেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাদের আশ্বস্ত করলেন যে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন সক্ষম তার কাছে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে স্বপ্ন ব্যাখ্যা দাতা নির্বাচনে তারা ভুল করেনি তারা যার শরণাপন্ন হয়েছে তিনি তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং তাদেরকে মানসিক অস্থিরতা মুক্ত করে সঠিক কর্মপদ্ধতি বলে দিতে পারবেন।
সভাপতি ভাবি মানুষ শিওর প্রয়োজন যথাসাধ্য দ্রুত সম্পাদন করতে চায় রোগী যখন তার রোগ নির্মাণ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় তখন চিকিৎসক যদি টালবাহানা শুরু করে অথবা চিকিৎসা শাস্ত্র দেখা বা অন্য কোন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করার বিলম্ব করে তাহলে রোগীর মন ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। হতাশ হয়ে সে ফিরে আসবে এবং হয়তো আর কখনো উক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার চেষ্টা করবে না।
তাই সূচনাতেই প্রার্থীর অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনেও যে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণের সক্ষম।
তিনি বললেন নির্দিষ্ট সময়ে তোমাদের খাবার আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিব অর্থাৎ অবিলম্বেই তাদের সমস্যার সমাধান দেয়া হবে এবং তারা তাদের জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবে । দীর্ঘ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লামের কাছে বসে থাকার

অবকাশ তাদের নেই । তাই তিনি বললেন তোমাদের নির্ধারিত খাবার আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে বিদায় করে দিব ।

কাঙ্খিত বস্তুর আলোচনায় অন্তরে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়

খাবার কয়েদিদের কাছে খুবই কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম খাবারের কথা উল্লেখ করে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি করতে চাইলেন খাবারের বিষয়টি সকলের কাছেই পছন্দনীয় বিশেষত অপরিমিত খাবারের উপর নির্ভরশীল কয়েদিদের কাছে তো তা আরো অধিক লবণে বস্তু তাই খাবারের কথা উল্লেখ করা মাত্রই তাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হল অতিরিক্ত কথা শোনার জন্য তারা উৎসাহী হয়ে উঠলো।
অতঃপর নবীর প্রকৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষমতাকে নিজের যোগ্যতা বলে দাবি না করে তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ রূপে ঘোষণা দিলেন এবং বক্তব্যের প্রতি পরিবর্তন করে ফেললেন এ ধরনের হেকমত ও প্রজ্ঞাপুর্ণ পদ্ধতির দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না তিনি বললেন-আমি তোমাদের যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে উপদেশ দানের চাবিকাঠি হস্তগত করে নিবেন ।
স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনার পূর্বে তিনি কত সুতীক্ষ্নভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করে ফেললেন । বক্তব্যের গতি পরিবর্তন না করে যদি এ কথাটি তিনি সাদামাটা ভাবে বলে দিতেন তাহলে তারা তা শুনতে প্রস্তুত হত না কারণ অদ্ভুত ও ভীতিকর স্বপ্নের কারণে তারা ছিল অস্থিরচিত্র তাই কোনরূপ কালক্ষেপণ ছাড়াই তারা স্বস্তি ও সান্তনার বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে দীর্ঘ বক্তব্য শোনার মত সে ধৈর্য তাদের কোথায়।
কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম যখন বললেন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে আমার জ্ঞান-গরিমা মেধা ও যোগ্যতার কোন কৃতিত্ব নেই , এসবই আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং এর মাধ্যমেই তিনি দাওয়াত ইল্লাল্লাহ এর দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলেন । যার সূক্ষ্মতা নিপুনতা ও হৃদয়গ্রাহিতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

কি চমৎকার তার এ হেকমত পূর্ণ ও প্রজ্ঞা পূর্ণ দাওয়াত পদ্ধতি । যদি তিনি কয়েদিদয়কে এভাবে সম্বোধন করতেন: "সম্মানিত বন্ধুদয়! খানিক ধৈর্য ধারণ কর । এক্ষুনি আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি। তবে তার পূর্বে শুনে রাখো ! আমাদের জীবনে এমন একটি বিষয় রয়েছে, যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এই স্বপ্নের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। তাহলে কিছুতেই তারা তার কথার প্রতি মনোযোগী হত না। বিশেষত যে বিষয়টির সাথে

তাদের কোনই যোগসূত্র নেই এবং যা শোনার জন্য তারা আসেওনি । তাই কথার গতি অব্যাহত রেখে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন।

সুকৌশলে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কথার গতি পরিবর্তন

"ذلكما علمني ربي"

"আমি তোমাদেরকে যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন।" হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কালীন সে নাজুক প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির চিত্র আমাদের সামনে থাকতে হবে। একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াত ছাড়া আর কোথাও এ চমৎকার ও প্রজ্ঞাপুর্ণ দেওয়াতে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামী দাওয়াতে তাবলীগের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক নাজুক ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি এবং এর চেয়ে সুন্দর ও সুনিপন দাওয়াতের ভাষা ও পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি।

لا ياتيكما طعام ترزقانه থেকে ذلكما مما علمني ربي পর্যন্ত আয়াত অংশের অর্থ ও মর্মের দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে , 'রব' শব্দটি উচ্চারণ করে তিনি কত সূক্ষ্মভাবে তাদেরকে তাওহীদের কথা আহবান করলেন। এর চেয়ে সুন্দর, সাবলীল, সুনিপন, হৃদয়গ্রাহী এবং বক্তব্যের গতি পরিবর্তনের বলিষ্ঠ পদ্ধতি আর ক ি
হতে পারে? যেন তিনি বলতে চাইলেন: তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার সে যোগ্যতাআমার কোথায় ? আমি তো এক দুর্বল, অসহায় ও দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি মাত্র । মানুষ আমাকে জেলখানায় ঠেলে দিল অথচ আমি তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমার মত এক দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় , সম্বলহীন কারাবন্দি নিজেকে জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার উপযোগী মনে করা বোকামি ছাড়া আর কি? এটাতো শুধুমাত্র মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর অনুগ্রহ, যিনি আমাকে ইলম ও প্রজ্ঞা দান করেছেন।

শত বছরের পথ তিনি মুহুর্তে অতিক্রম করলেন

"আমার প্রতিপালক কেন আমাকে এ ইলম দান করলেন?" এ প্রশ্ন উত্থাপন করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবানের আরেকটি চমৎকার পথ বের করে নিলেন। বস্তুত এটা ছিল এক সু দীর্ঘ পথ। স্বীয় প্রজ্ঞা , অন্তর দৃষ্টি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত সু তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর ধী শক্তি দ্বারা অতিক্রম করে ফেললেন। এই দুস্তর পথ যাকে শত বছরের দুর্গম পথ বললে অত্যুক্তি হবে না এবং যা অতিক্রমে

যেকোনো গবেষক ও দার্শনিকেরও শত বছর প্রয়োজন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বলে তা চোখের পলকেই অতিক্রম করে ফেললেন তিনি বললেন:

ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون

আমি তোমাদেরকে যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি ৷ -(সূরা ইউসুফ,37)

এবার হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন যে, তিনি এখন এক নিরাপদ অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছেন। যেন তিনি কোন সুউচ্চ পাহাড়ে আরোহন করে তার তলদেশে সমবেত জনতা কে উদ্দেশ্য করে বলছেন:

يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار

“হে কারারক্ষীদয় ! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ শ্রেয়?” এ কথাটি যদি হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম শুরুতেই বলে দিতেন তাহলে তা তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতো। তাদের হৃদয় ও বিবেক তা গ্রহণে প্রস্তুত হত না ৷ এখন তিনি বলার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে বলে ফেললেন, হে কারা বন্ধুদয় ! একাধিক প্রতিপালক উত্তম না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ উত্তম ?

এখানে বক্তব্যের পূর্বাপর যোগসূত্রএবং কোরআন করিমের বিন্যাস পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদি তিনি পর্যালোচনার ধারাবাহিকতা অখুন্ন রাখতেন, তাহলে তা হতো একেবারেই নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য কথা। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম নিজের বিচক্ষণতা গুনে কয়েদিদের চেহারায় প্রসন্নতা লক্ষ্য করে উপলব্ধি করে ফেললেন যে, এখন এরা এই আল্লাহর বাণী শোনার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত ৷ কারণ এটা এমন এক পয়গাম যা মহান আল্লাহ তার নবী সাঃ এর মাধ্যমে প্রিয় বান্দাদেরকে দান করেছেন,

يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار এব ংএর ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গি ذلكما مما علمني ربي

এর ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে তুলনা করলে উভয়টির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টিতে নম্রতা ও কোমলতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ শ্রেয় ? এ বক্তব্যে শক্তি, দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা এবং পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠেছে এবং এখন তারা এ শানিত ও বলিষ্ঠ বক্তব্য সহজেই বুঝতে সক্ষম। হযরত

ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম যুক্তি ও দার্শনিক ভাষার অবতারণা করতেন তাহলে তা তাদের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে।
অতঃপর তিনি বললেন:

ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان

"তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের এবাদত করছ যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা নির্ধারণ করেছ আল্লাহ এগুলোর কোন প্রমাণ পাঠাননি"।
(সূরা ইউসুফ আয়াত- ৪০)
এগুলোতো অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কতগুলো নাম মাত্র যা প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা ও বিভিন্ন প্রতিমা পূজারী জাতিসমূহ নির্ধারণ করেছে কাল পরিক্রমায় এদের এ কল্পনা প্রসুত মূর্তি সমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথক পৃথক ভাস্কর্য শাস্ত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। কুরআনুল করিমের বিশেষ মোজেজা যে এ বাস্তব ও কাল্পনিক মিথ্যা মাবুদসমূহের জন্য আসমা শব্দ গ্রহণ করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও ইলমুল ইসলাম এর ইতিহাসের সাথে যাদের পরিচয় রয়েছে তারাই শুধু উপলব্ধি করতে পারে উক্ত শব্দের অলৌকিকত্ব এর নাম সর্বস্ব মাবুদসমূহের অস্তিত্ব কোথাও এবং কখনো ছিল না কোথায় পেল তারা বৃষ্টির দেবতা যুদ্ধের দেবতা সৌন্দর্যের দেবতা ভালোবাসা দেবতা কল্পনার জগত ছাড়া কোথাও এগুলোর অস্তিত্ব কি খুঁজে পাওয়া যাবে তাই কুরআনুল করিম ঘোষণা করছে এগুলো তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের মনগড়া কতগুলো নাম মাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার কোন প্রমাণ নেই।
কুরআনুল করিমের এ বিস্ময়কর মুজেজা শাশ্বত চিরন্তন কল্পনা প্রসুত কতগুলো নামের সমষ্টি ছাড়া মূর্তি পূজার কোন ভিত্তি নেই আল কোরআন মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে তার অসারতা তুলে ধরেছেন:'এগুলোতো শুধুমাত্র কতগুলো নাম।"

আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত এক মহান দায়ীর দাওয়াত পদ্ধতি

এবার হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়াসাল্লাম অনুভব করে ফেললেন যে , তাদের চিন্তা ও বিবেক পরিপক্কতায় পৌঁছেছে। এখন হেকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হলো : বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা এবং তাওহীদের উপর বিস্তৃত আলোচনা না করা। একজন শল্য চিকিৎসক জানে রোগীর কখন কতটুকু ঔষধ ও কি পথ্য প্রয়োজন। রুগীর প্রয়োজনীয়তা ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সে সম্যখ অবগত।

আল্লাহর অহীপ্রাপ্ত একজন দায়ির এটাই দাওয়াত পদ্ধতি। দাওয়াতের যোগ্যতা আল্লাহ যাকে দান করেছেন, তিনি জানেন যে, বিশেষ অবস্থানে পৌঁছার পর দায়ীর জন্য তা লংঘন করা উচিত নয় । এজন্যই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নীতি ও আইনের আওতা সীমাবদ্ধ করা যায় না । অন্যথা দাওয়াতের সুবিশাল কর্ম ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে । দাওয়াতের জন্য প্রয়োজন আবেগ, উদারতা উৎসাহ ও প্রফুল্লতা। দায়ী ও মুবাল্লিগকে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ও আইনের অধীন করে দেয়া তার প্রতি অবিচার করার নামান্তর।

হযরত মুসা আলাই সালাম এর দাওয়াত

হযরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত। এ দাওয়াত ছিল দূরাচার ফেরাউনের প্রতি মহান নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত। তার দাওয়াত পদ্ধতি অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালামের দাওয়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ দাওয়াতের মৌলিক ও প্রধান উপাদান ঈমান, তাওহীদ, একত্ববাদ, পুনরুত্থান দিবস, পরকাল এবং আল্লাহ তাআলার সিফাত ও অদৃশ্য জগৎ ইত্যাদি বিষয় সমূহ ছাড়াও আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার দাওয়াতে অন্তর্ভুক্ত ছিল । তা হল নিজের জাতি বনী ইসরাইলকে পাপিষ্ঠ ফেরাউনের দাসত্বের শৃংখল হতে মুক্ত করা এবং ঈমান ও তাওহীদ রক্ষায় বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের যে অত্যাচার উৎপীরন চলছিল তা হতে তাদেরকে উদ্ধার করা।
যে বিশেষ প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করলেন এবং প্রতিপালিত হলেন, যে প্রতিকূল সমাজ ও পরিবেশ তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে, তাই হযরত মুসা আলাই সালাম এর দায়িত্ব কে অন্যান্য নবীদের দায়িত্ব থেকে পৃথক করে দেয়। হযরত মুসা আলাইহিস সাল্লাম আদিষ্ট হলেন -তিনি যেন দুরাচার ফেরাউনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে সে জালিম, স্বৈরাচারী এবং বনী ইসরাইলের উপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তারকারী। যে বনী ইসরাঈল মহান আম্বিয়া আলাইহিস সালামের উত্তরসূরী, সমকালীন বিশ্বে যাদের পূর্বপুরুষগণ ঈমান ও তাওহীদের একমাত্র নিশান বরদার ছিল।
ব্যাপারটি এমন বিশেষ কোন সম্প্রদায় গুষ্টির নয়, যারা অতীতে কখনো ছিল না কিংবা বর্তমানে নেই । যদি বিষয়টি এমন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের হত যাদের উপর কোন স্বৈরাচারী শাসক স্বীয় প্রভুক্ত বিস্তার করে আছে, অত্যাচার ও পাশবিক আচরণের মাধ্যমে যাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং ঈমান ও তাওহীদের কারণে তাদেরকে কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাহলে বিষয়টিকে সহজ ও অসাধারণ মনে করা যেত। কারণ এটা পৃথিবীতে সচরাচর ঘটে আসছে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়েই এই ধরনের

দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে মানবজাতির এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু বনী ইসরাঈলের অবস্থা এমন সাধারণ ও স্বাভাবিক ছিল না বরং অবস্থায় এই ছিল যে নৈতিক চারিত্রিক ও ধর্মীয় চরম অবক্ষয় এবং আরো বহু রকমের মানবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এ একটি সম্প্রদায়ই শুধু তদানীন্তন পৃথিবীতে নির্ভেজাল ঈমান ও তাওহীদের উত্তরাধিকারী ও পতাকাবাহির রূপে অবশিষ্ট ছিল। ইতিহাস সাক্ষী যুগে যুগে একমাত্র বনি ইসরাইলি নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ঈমান ও তাওহীদের উপর কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল । পৃথিবীতে এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন ইহুদিগণ ব্যতীত পৃথিবীতে একজন মানুষও ঈমান ও তাওহীদের সাথে পরিচিত ছিল না । কোরআনুল করিমে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর বনি ইসরাইলের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বারবার উল্লিখিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ এটাই বলেন যে, শিরক ও পৌত্তলিকতার সেই অন্ধকার যুগেও একমাত্র বনীইসরাইল ঈমান ও তাওহীদের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল।

পরিস্থিতি শুধু এতটুকু ছিল না যে, বনী ইসরাঈল ফেরাউন ও তার বর্বর বাহিনীর ঘোড়ার খুরের আঘাতে নিষ্পেষিত হচ্ছিল এবং এক অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকের করুণার ভিখারি হয়ে জীবন যাপন করছিল বরং বনী ইসরাঈল ছিল ঈমান ও তাওহীদের পতাকাবাহী এবং মিরাসে নবুয়তের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তারা ছিল সেই মহান আমানতের ধারক,যা পূর্ববর্তী নবীগণ রেখে গিয়েছিলেন।

হযরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অতিরিক্ত দায়িত্ব

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দায়িত্ব ছিল অন্যান্য নবীদের দায়িত্ব থেকে ভিন্ন ।কারণ অন্যান্য নবীদের তুলনায় তার উপর অতিরিক্ত আরেকটি দায়িত্ব ছিল। প্রথম দায়িত্ব তো ছিল ঈমান ও তাওহীদের বাণী প্রচার করা, দুরাচার ফেরাউনকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পথে আহবান করা, যিনি হুকুমত, কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা এক ও অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল বনী ইসরাঈলকে অত্যাচারী ফেরাউনের দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা ।কোরআনুল করিমের বর্ণিত হয়েছে:

فأتياه فقولا ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى

অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল আমরা উভয়ই তোমার পালন করতে প্রেরিত রাসুল অতএব আমাদের সাথে বনি ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো

না আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নির্দশন করেছে। কিন্তনিয়ে তোমার কাছে এসেছি এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে ।
সূরা তোহা আয়াত ৪৭

হযরত মুসা আঃ সালামের দাওয়াতের এটা এমন একটি দিক যা তার দায়িত্বকে অন্যান্য নবীদের দায়িত্ব থেকে আলাদা বিশেষত্ব দান করেছে। তার অবস্থা কেন এত প্রতিকূল ও সমস্যা সংখ্যক ছিল কারণ হযরত মুসা আলাই সালাম এর জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ।তার জীবন প্রবাহ ছিল অন্যান্য নবীদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধর্মী।

ফেরাউনের চক্রান্ত নস্যাৎ হল

এক চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শ্বাস রুদ্ধকর পরিবেশে হযরত মুসা আলাই সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ফেরাউন তার গোয়েন্দা (ইন্টেলিজেন্স) সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, বনি ইসরাইলে জন্মগ্রহণকারী কোন পুরুষ নবজাতককে যেন জীবিত ছেড়ে না দেয় ।
ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين
ফেরাউন দেশে খুবই পরাক্রমশালী হয়ে গিয়েছিল। সে মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল । সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।
(সূরা কাসাস আয়াত ৪)

ফেরাউন সুনিপুণভাবে স্বীয় চক্রান্ত নির্ধারণ করে রেখেছিল যেমন আজকের উন্নত ও সুশৃংখল সরকার সমূহ নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত নির্ধারণ করে রাখে ।তার সেই চক্রান্ত হলো বনি ইসরাঈলের কোন পুরুষ নবজাতককে জীবিত না রাখা।
এভাবে একটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে গেলে বনী ইসরাঈলের দিক থেকে সে সবসময়য়ের জন্য আশঙ্কা মুক্ত হয়ে যাবে। শুধু নারীরা থেকে গেলে তাদের দ্বারা ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। বড়দসুতরাং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতে হবেএবংকন্যাসন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হবে।
স্বৈরাচারী ফেরাউনের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারো সুযোগ ছিল না। সে দেশের সে নির্দেশ জারি করল বনী ইসরাঈলের কোন পুরুষ নবজাতক যেন জীবিত থাকতে না পারে কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক মহান

নবীর আবির্ভাব ঘটানো। ফেরাউন চক্রান্ত করেছিল বনি ইসরায়েল থেকে পরিত্রান লাভ করার, বনী ইসরাইলে যেন এমন কোন পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করতে না পারে, যে তা রাজত্ব ,কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের দাবি ধূলিসাৎ করে দেবে, যার মাধ্যমে তার সমস্ত পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যাবে । কিন্তু মহান আল্লাহ তার সকল দূরভিসন্ধি ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন এবং বনি ইসরাঈলের মধ্যে মুসা আলাই সালাম এর জন্ম গ্রহণের ফয়সালা দিলেন । সেই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার আশঙ্কায় তাদের পুত্র সন্তানদেরকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, যাকে নিয়ে ফেরাউন উদ্দীগ্ন উৎকণ্ঠিত ও শংকিতছিল, সে জন্মগ্রহণ করলো এবং আল্লাহর অভিপ্রায়ই পূর্ণ হল। তিনি জন্মগ্রহণ করলেন লালিত পালিত হলেন এবং যৌবনে পদার্পণ করলেন । কিন্তু কিভাবে তিনি ফেরাউনের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে জন্মগ্রহণ করলেন, এটা মহান ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা । মহান আল্লাহর এক অপূর্ব লীলা খেলা, কারণ এ নবজাতক তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুশমনের কোলে ষলালিত পালিত হয়েছিলেন।

অলৌকিক পদ্ধতিতে মুসা আঃ এর প্রতিপালন

পুরো ঘটনাটি কল্পনার দৃষ্টিতে রাখলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে তার প্রতিটি অধ্যায়ই কি অলৌকিক কি বিস্ময়কর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঘটনাটি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর এক অভূতপূর্ব কুদরতি লীলা খেলা:

واوحينا الى امي موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان يرفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن الجنب وهم لا يشعرون فاحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون

“মুসার মায়ের অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাকো যখন তুমি তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করবে তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে এবং ভয় করবে না দুঃখও করবে না আমি অবশ্যই তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে আমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।”

-(সূরা কসাস আয়াত ৮)

অতঃপর ফেরাউনের পরিবার তাকে (শিশু-মুসাকে) কে উঠিয়ে নিল । এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। নিশ্চয়ই ফেরাউন , হামান ও তাদের সেনাবাহিনী অপরাধী ছিল। ফেরাউনের স্ত্রী বলল এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন মনি । তাকে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। সকালে মুছা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়েছিল । যাতে সে আস্থাশীল হয় এজন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত। সে মুসার ভগ্নিকে বলল ! “তার পেছনে পেছনে যাও”। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল। পূর্ব হতেই আমি ধাত্রী স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম । মুসার ভগ্নি বলল, তোমাদের কি কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে ? অতপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায় , সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য , কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না।

- (সূরা কাসাস আয়াত ৭-১৩)

হযরত মুসা আলাই সালাম ফেরাউনের ঘরে লালিত - পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করার পর সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন । অতঃপর রাজ পরিবারভুক্ত জনৈক কিবতিকে হত্যা করার ঘটনা ঘটে গেল।

ودخل المدينه على حين غفله من هذا فوجد فيها رجلين يقتلاني هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين العدو فوكزه موسى فقدوا عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين

,

সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক । সেখানে সে দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল, একজন তার নিজের দলের এবং অপরজন তার শত্রুদলের । মুসার দলের লোকটি, তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো , তখন মুসা তাকে ঘুসি মারল এবং মৃত্যু হয়ে গেল। মুসা বলল, এটা শয়তানের কান্ড । সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী । সে বলল ,”হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো আমার নফসের প্রতি জুলুম করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো ।” ফলে তিনি তাকে ক্ষমা করলেন । তিনি তো ক্ষমাশীল ,পরম দয়ালু । সে আরো বললো ,হে আমার প্রতিপালক তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।

-(সূরা কাসাস আয়াত ১৫-১৭)

এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট মুজেজা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর অলৌকিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ, আল্লাহ তায়ালার সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম নিদর্শন । দাওয়াতের জন্য এবং বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার জন্য তিনি এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন, যার অবস্থা ছিল বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল ও স্পর্শকাতর।

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

হযরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দিন তথা তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত প্রদান করার জন্য আদিষ্ট হলেন সাথে সাথে তার উপর অর্পিত হল বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্ব মুক্ত করার কোট সু কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যই প্রয়োজন প্রচন্ড মনোবল অসীম সাহস ও কঠিন পরীক্ষা নিরপেক্ষ থাকা আল্লাহর দ্বীনের পথে দাওয়াত প্রদান করা কঠিন ও মেহনতের কাজ। তাতে ঈমান ও আত্মবিশ্বাস ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ নির্ভরতা সবই প্রয়োজন একটি জাতির রিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করাও যেমন তেমন কাজ নয় এজন্য মুখোমুখি হতে হয় কঠিন পরীক্ষার অনুভুতি হযরত মুসা আঃ এর মধ্যে কিছুটা দ্বিধাও ভয়ের সৃষ্টি করল তার এ দ্বিধা ও ভয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তারই ভাষায় কুরআনুল করিমে এরশাদ হয়েছে:

ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون

তাদের কাছে আমি একটি অপরাধ কি বৃত্তিকে হত্যা করার করে ফেলেছি তাই আমি আশঙ্কা করছি যে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

হযরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত করে ফেরাউন তাকে হুমকি প্রদর্শন করে বলেছে:

وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين

আর তুমি তো সেই জঘন্য অপরাধ করেছ । নিশ্চয়ই তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত।

ফেরাউনের এই হুমকি প্রদর্শন হযরত মুসা আঃ এর মধ্যে যে ভীতি ও সংখ্যার সৃষ্টি করল তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করে দিলেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকেই উল্লেখিত দুই গুরুদায়িত্বের জন্য নির্বাচন করলেন কারণ এর জন্য তিনি যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি।

কুরআনুল করিমে হযরত মুসা আলাই সালাম এর সিরাত এবং নবুয়তের দায়িত্ব পালনের চিত্র এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে যে, তার থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় কিভাবে একজন

আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত নবী, একজন প্রজ্ঞাবান দা'য়ী আপন বক্তব্য পেশ করেন এবং কিভাবে ঈমানের দাবি ও চেতনা এবং দাওয়াতের সংবেদনশীল দিকসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়ে উভয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন। তিনি ছিলেন একজন সত্য নবী, মানবজাতির জন্য আদর্শ, তার দাওয়াত ও সম্মোধন পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহতালার নির্বাচিত একজন দায়ির দাওয়াত ও সম্বোধন পদ্ধতি কি হয়ে থাকে এবং তোষামোদ ও চাটুকারিতা যাদের বৈশিষ্ট্য, যারা নিজেদেরকে বাস্তবদর্শী দায়ী হিসেবে দাবি করে থাকে, তাদের দাওয়াত পদ্ধতি কি হয়ে থাকে।

ফেরাউনের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'লার এক প্রিয়তম বান্দা ও মহান নবীকে প্রেরণ করা হচ্ছে । কিন্তু কোথায় ? কার উদ্দেশ্যে ? এমন এক নিকৃষ্টতম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে , যে আল্লাহতালার প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহর এক পরম বন্ধু তার চরম ঘৃণিত শত্রুর প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হচ্ছেন। একজন এক মেরুতে, অপরজন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী। দুইজন সাধারণ মানুষের মাঝে এ ধরনের বৈপরীত্য থাকে না এই বৈপরীত্য এমন দুই ব্যক্তির মাঝে যাদের একজন অপরজনের শত্রু সমকালীন শ্রেষ্ঠ নবীকে এমন এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে যে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে সদর্পে ঘোষণা দিয়েছিল:

انا ربكم الاعلى 'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

এমন এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে শুধু আল্লাহকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিজে রবুবিয়াতের দাবি করে বসেছিল । পৃথিবীর এক অভিশপ্ত, মহাপাপী ও ঘৃণিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর এক প্রিয়তম ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হচ্ছে:

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى

"তোমরা তার সাথে নম্র কোমল ভাষায় কথা বলবে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় করবে।"

-(সুরা তো আহা আয়াত ৪৪)।

ফেরাউনের ন্যায় এক খোদাদ্রোহীকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্র কোমল ভাষা প্রয়োগের নির্দেশের পর আমাদের বর্তমান দায়ী ও মুবাল্লিগ দের রুক্ষ ও কঠোর ভাষা প্রয়োগের অবকাশ থাকে কিভাবে? কারণ সীমালংঘন ও আল্লাহদ্রোহিতা ফেরাউনের চেয়ে অগ্রগামী

আর কে হতে পারে , যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইলাহ বলে দাবি করেছিল। অথচ এমন মহা পাপিষ্ঠ কে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাই সালাম কি নির্দেশ দিলেন তার সাথে যেন নম্র কোমল ভাষায় কথা বলেন।
হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন নির্দেশ দেয়া হল তারা যেন ফেরাউনের রাজ দরবারে প্রবেশ করে তাকে সত্যের বাণী শুনিয়ে দেন। তখন তারা বললেন:
ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করছি যে, সে আমাদের উপর সীমালংঘন করবে অথবা আরো ঔদ্যত প্রকাশ করবে।
(সুরা ত্বহা আয়াত ৪৫)

যেহেতু হযরত মুসা আলাইহিস সাল্লাম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ের সাথে জড়িত ছিলেন এবং তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল তাই আল্লাহতালা তাদের কে অভয় দিয়ে বললেন:

لا تخف انني معك ما اسمع وارى فاتياه فاقولا ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم وجئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى

তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সাথে আছি । আমি শুনছি ও দেখছি । সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রসূল সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না । আমরা তো তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথঅনুসরণ করে । আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ এসেছে যে, যে মিথ্যা আরোপ করে এবং উপেক্ষা করে তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। ফেরাউন বলল ,হে মুসা কে তোমাদের প্রতিপালক ? মুসা আলাইহিস সালাম বলল আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে স্বীয় আকৃতি দান করেছেন । অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন । ফেরাউন বলল, তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, তার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃত হন না। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা করেছেন এবং তাতে তোমাদের চলবার পথ করে দিয়েছেন । তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন । এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।
-(সুরা তোহা আয়াত ৪৬-৫৩।)

ফেরাউনের দুষ্ট বুদ্ধি অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ভাবে কাজ করতে লাগলো। সে আপন তূণীর হতে এমন একটি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করল, যা যে কোনো দা'য়ী ও মুবাল্লিগকে আঘাত করতে সক্ষম। তাই সে যত বড় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান , সচেতন , পন্ডিত হন এবং দাওয়াতের হেকমত, দর্শন এবং মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে যত অভিজ্ঞ হন না কেন ,সমাজবিজ্ঞান ও বিতর্কশাস্ত্রে যত শ্রেষ্ঠত্ব তার থাকুক না কেন, এ তীর দ্বারা সে নিশ্চিত রূপে ধরাশায়ী হবে । উক্ত তীর ছিল ফেরাউনের এই প্রশ্নটি:

فما بالقرون الاولى

"তাহলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি?" এটা ছিল দুষ্টু বুদ্ধি ও কচক্রী ফেরাউনের একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজদরবারে উপস্থিত লোকদেরকে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রূপে উত্তেজিত করে, তার থেকে পরিত্রাণ লাভ করা । এভাবে সে এক গুলিতে দুই স্বীকার করতে চেয়েছিল । একটি হলো ঈমান থেকে তাদেরকে ভুলিয়ে রাখা , কারণ এ দাওয়াত ছিল তার জন্য চরম ভীতিকর বিষয়। তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশ্বাস হৃদয়কে আন্দলিত করে তোলে। মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে সুপ্ত ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে। ফেরাউনের অনুচরবৃন্দ তো আর যাই হোক , মানুষই ছিল । জ্ঞানী , চিন্তাশীল ও সচেতন লোক তাদের মধ্যেও ছিল। যাদের চিন্তা ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি । সুতরাং সম্ভাবনা ছিল যে, হযরত মূসা আঃ এর তাওহীদের দাওয়াত তাদের অন্তরে ঈমানী চেতনাকে জাগিয়ে তুলবে। তাই ফেরাউন যে কোন মূল্যে মূসা আলাইহিস সালামের উক্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে লোকদের কল্পনা দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিল । কারণ আল্লাহ দ্রোহী এ ফেরাউন ঈমান ও তাওহীদের ব্যাপারে ভীষণ ভীতু ছিল। তাই সে এমনই প্রশ্ন করে বসলো যেন তা শুনে তার অনুচর ও সহচর বৃন্দ সতর্ক হয়ে যায় এবং হযরত মুসা আলাইহি সালাম সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে তিনি তাদেরকে পূর্বপুরুষদের পথ ও আদর্শ হতে বিচ্যুত করতে চান । তাই সে প্রশ্ন ছুড়ে মারল তাহলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? ফেরাউনের এ প্রশ্নের দুটি উত্তরই হতে পারত। হয়তো তিনি কোন পরোয়া না করে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে পারতেন যে, তারা সকলে জাহান্নামী;

انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون

"তোমরা এবং তোমাদের পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সকলে তো জাহান্নামের ইন্ধন । তোমরা সকলে তাতে নিক্ষিপ্ত হবে ।" (সূরা আম্বিয়া আয়াত ৯৮)

হযরত মুসা আলাই সালাম যদি এ উত্তর দিতেন , তাহলে নিঃসন্দেহে কথা বলার পথ চিরহীত হয়ে যেত । সকলে ক্রোধে ফেটে পড়তো এবং তাদের মূর্খতা সুলভ আত্মমর্যাদা

বোধ ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে যেত। কিংবা সকলে মিলে মুসা আলাই সালাম এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। অথবা হট্টগোল সৃষ্টি করে বলে উঠতো- মুসা তুমি একি বলছো ? আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের অবমাননা করছো? আমাদের বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাত হানছো ?

অথবা তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করতেন কিংবা প্রচলিত রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণপূর্বক বলতে পারতেন মহান পূর্বপুরুষ গণের প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা আমার অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে । তারা নিঃসন্দেহে বিরাট জ্ঞানী ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যদি এই কথা অবলম্বন করতেন, তাহলে সাথে সাথে ফেরাউন তাকে লা জবাব করে দিয়ে বলে উঠতো , তারা যখন বিরাট জ্ঞানী ও বিশাল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাহলে আমরা তো তাদেরই আকিদা বিশ্বাসও নীতি আদর্শের প্রতিষ্ঠিত আছি।:

"ফেরাউন বলল , তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? মুসা আঃ বললেন, তার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃত ও হন না ।"

(সূরা তোহা আয়াত 51 -52)

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এখান থেকে তার বক্তব্যের গতি পুনরায় সে বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে দিলেন, যা পূর্ব থেকে চলে আসছিল । তিনি বলতে পারতেন যে, পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান রয়েছে। যদি তিনি এরূপ বলতেন, তাহলে অবস্থা পাল্টে যেত। ফেরাউন বক্তৃতা শুরু করে দিত এবং তৎকালীন ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত মানুষের তৈরি মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী সমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে থাকতো। যেগুলো তখন ঐতিহাসিক বর্ণনা রূপে সরকারিভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো । এজন্য হযরত মূসা আঃ এমন এক জবাব দিলেন যার কোন উত্তর তার কাছে ছিল না। যা থেকে পলায়ন করার কোন সুযোগ তার ছিল না।:

"তিনি বললেন তার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃত হন না ।" তার এসব জবাবের শব্দসমূহের সাবলীলতা, ভাব গভীরতা ও সারগর্ভতার প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একটি ধ্রুবসত্য ও অব্যর্থ কথা তিনি সমপরিমাণ শব্দ দ্বারা কি চমৎকারভাবে প্রকাশ করলেন । এটাই হল নববি দাওয়াতের অপূর্ব মোজেজা। আমাদের কেউ যদি এরূপ কঠিন পরীক্ষা সম্মুখীন হত , তাহলে আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে হাজারো পদ্ধতি অবলম্বন করত এবং পরিত্রাণ লাভ করা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যেত। যেমন, হয়তো বলতো - এটা রাখো,

এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আমার উদ্দেশ্য বিগত কালের সাথে নয় । আমার চিন্তা তো বর্তমান কাল নিয়ে।

কিন্তু হযরত মুসা আলাই সাল্লাম দাওয়াতের প্রসঙ্গ ত্যাগ করলেন না এবং বক্তব্য দানের যে সুবর্ণ সুযোগ তার হস্তগত হয়েছিল তা তিনি হাতছাড়া করলেন না বরং এমন গভীর প্রজ্ঞা ও সুনিপনতার সাথে মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন ,যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না । এক শব্দেই সমগ্র বিষয়টির সমাধান দিয়ে দিলেন : علمها عند ربي (তার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট)এবং এটা বলেই তিনি উদ্দেশ্য বিষয়ে চলে এলেন।

তিনি কথার ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হতে দিলেন না এবং সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার সে সমস্ত সিফাত সমূহ বলে যেতে লাগলেন যেগুলো ফেরাউন অস্বীকার করত ,যেগুলো থেকে সে কথার গতি ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল । এ ধরনের ভাব গর্ভ ও সারগর্ভ আয়াত উচ্চারণ করা মাত্রই ভাষা ও অলংকারিক রুচিবোধ আত্মহারা হয়ে যায়। ভাষা ও অলংকারের এ চমৎকার উপস্থাপনা দ্বারা মন নেচে ওঠে বিবেক ও চিন্তাশক্তি নিস্তব্ধ হয়ে যায়।:

“তার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে । আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মিত হন না। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের চলবার পথ করে দিয়েছেন তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি । তোমরা আহার করো এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও। অবশ্যই ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।”

-(সূরা তোহা আয়াত ৫২-৫৪)

ফেরাউনের পশ্চাৎ প্রসারণ ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অবিচলতা

ফেরাউনের পশ্চাৎ প্রসারণ এবং হযরত মুসা আলাই সাল্লাম এর অবিচলতা সম্পর্কে কোরআন করিমের সূরা শু’য়ারায় বর্ণিত হয়েছে-

قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تجتمعون قال ربكم رب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون

ফেরাউন বলল, জগৎসমূহের প্রতিপালক আবার কি ? মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক । যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমরা কি শুনছো না ? ‘মুসা আঃ বললেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের

প্রতিপালক । ফেরাউন বলল তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল নিশ্চয়ই পাগল।(সূরা শুয়ারা আয়াত ২৩- ২৭)

এটা ছিল সুচতুর ফেরাউনের কৌশলে আলোচনার গতি পরিবর্তন করার একটি অপপ্রয়াস । সে চেয়েছিল মূল বিষয় থেকে মানুষের চিন্তাকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে এবং নিজস্ব বাক চাতুর্য, রাজনৈতিক কূট কৌশল এবং মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির উপর তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করতে । অপরদিকে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেজা এখানে যে, তিনি মূল বিষয় থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফেরাউন বলল ,'জগৎসমূহের প্রতিপালক আবার কি? সে চেয়েছিল হযরত মুসা আলাই সালাম এর মুখ থেকে এমন কোন জবাব বের করতে ,যা কথার গতিকে ভিন্ন প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে যাবে এবং বিতর্ক শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সাল্লাম পুনরায় সেই একই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলতে লাগলেন -

رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مؤمنين

“তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক । যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও । তার উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং ফেরাউনের রাজত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা । তাই তিনি رب السماوات والارض وما بينهما বলেই ক্ষান্ত হলেন না বরং সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন, ان كنتم موقنين (যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও ।) এভাবে চ্যালেঞ্জ করে তিনি তাদের মূল রোগ চিহ্নিত করে দিলেন । যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও অর্থাৎ তোমরা ঈমানের মহাসম্পদ থেকে বঞ্চিত । যদি তোমাদের ঈমান থাকতো , তাহলে দেখতে যে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক।

ফেরাউনের সামনে হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিস্তব্ধ করার এবং তার বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার একটিমাত্র পথ ছিল যা সে বারবার প্রয়োগ করেছিল । কোরআনুল করিমে তা বিভিন্ন শৈলীতে বর্ণিত হয়েছে قالت لمن حوله الا تستطيعون. (ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা কি শুনছো না ? “এ ব্যক্তি কি বলছে”! তোমাদের কি আত্মমর্যাদা বোধ নেই ? তোমাদের কি লজ্জা হয় না ? আমার পক্ষ হতে তাকে জবাব দেয়ার এবং তার মুখ বন্ধ করার তোমাদের কি সাহস নেই ? শুনছো না এ কি বলছে ? কিন্তু তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তিনি কথা পূর্ণ করে ফেললেন -

ربكم ورب اباءكم الاولين

“তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক”। ফেরাউন পুনরায় শেষবারের মতো চেষ্টা করল মুসা আঃ সালামের কথা কে উড়িয়ে দিতে এবং উপহাস ও তাচ্ছিল্যের ভাষায় বলল - ان رسولكم الذي ارسل اليكم لا مجنون “তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল নিশ্চয়ই পাগল।”

ফেরাউন মনে করেছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার এই উক্তির জবাবদানে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং বলবেন ,আমি পাগল নই। ফেরাউন মানুষের এই স্বভাবগত দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ছিল । কারণ যে কোন মানুষ তার ব্যক্তি সত্তার উপর আঘাত এলে , সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এ জাতীয় অবমাননাকে কেউ কখনো সহ্য করে নেয় না। ফেরাউন ভেবেছিল তার এ অবমাননাকর উক্তি শুনে হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধে ফেটে পড়বেন এবং বলতে থাকবেন কে বলেছে আমি পাগল ? ডাক দেখি কোন ডাক্তার, চিকিৎসক, অনুরূপ বিশেষজ্ঞ, আমাকে পরীক্ষা করে দেখুক । ফেরাউন হযরত মুসা আঃ কে পাগল ও অপ্রকৃতিস্থ বলার উদ্দেশ্য এটাই ছিল কিন্তু হযরত মুসা আঃ সব শুনেও না শোনার মত করে আপন বক্তব্যই অব্যাহত রাখলেন। قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, “তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে।”(সূরা শু’য়ারা আয়াত -২৮)

হযরত মুসা আলাইহি সালাম নিজের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। নিজের আত্মরক্ষায় একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত মহান নবী। তার দায়িত্ব ছিল ফেরাউনকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া সুতরাং পাগল, উন্মাদ ইত্যাদি সম্বোধন নিয়ে তার ভাববার সুযোগ কোথায় ? তাছাড়া হক ও সত্যের দাওয়াতের মোকাবেলায় এসবের গুরুত্ব বা কতটুকু ? যে সমাজ শিরক ও পৌত্যলিকতায় আচ্ছন্ন, যেখানে মূর্তি পূজা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে, যে সমাজ অন্যায় অনাচার ও পাপ পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত, যেখানে মানুষের ইজ্জত ও আব্রু নিরাপদ নয়, যেখানে নিষ্পাপ শিশুদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, সেই সমাজে পাগল ও উন্মাদ সম্মোধিত হওয়ার আঘাত তো কোন ব্যাপারই নয় । তাই তিনি শুনেও না শোনার মত করে বললেন , “তিনি সেই প্রতিপালক যে পূর্ব ও পশ্চিম এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু প্রতিপালক” সাথে আরেকটি বাক্য সংযোজন করে বললেন ان كنتم تعقلون “যদি তোমরা বুঝতে ?”

হযরত মুসা আঃ এর জবাব ফেরাউনের জন্য এমন এক অব্যর্থ আঘাত যা তার কলিজা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছার কথা। কারণ সে তো মনে করত, সে-ই পূর্ব-পশ্চিমের মালিক, তার ধারণা ছিল সমগ্র বিশ্ব বলতে মিশরকে বুঝায় । আর সে যেহেতু মিশরের অধিপতি সুতরাং গোটা বিশ্বই তার । প্রধানত হযরত মুসা আলাই সাল্লাম পূর্ব ও পশ্চিম এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর

কথা উল্লেখ করে ফেরাউনের সেই আত্ম অহমিকা ও তার শাসন কর্তৃত্বের উপর প্রচন্ড আঘাত হানলেন এবং সেই ভিত্তিমূলকেই নির্মূল করে দিলেন, যার উপর তার মিথ্যা খোদাইর ইমারত দণ্ডায়মান ছিল । যা নিয়ে তার অহংকার ও আত্ম অহমিকা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । নববীর দাওয়াত ও হেকমতের এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যেখানে দায়ী ও মাদকু ব্যক্তি দুইজন সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থানকারী দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর অথচ দায়ীর অবস্থা ছিল বড়ই নাজুক নও দুর্বল এবং যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে সে ছিল মিশরের অধিবাসী ও সর্বময় ক্ষমতার দাবিদার । এর জন্যই দাওয়াতের এমন দৃষ্টান্ত কে নির্ধারণ করেছি কারণ এর দ্বারা দাওয়াতের সুদূর-প্রসারী শিক্ষা এবং দাওয়াতের সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায় , যা অনুসরণের মাধ্যমে একজন দায়ী ও মুবাল্লিগ দাওয়াতে সুচিন্তিত ও বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈল

হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাইলকে দাওয়াত প্রদানে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং যে অবস্থা সম্মুখীন হয়েছেন তা পর্যালোচনা করলে তার দাওয়াতের চারটি পর্যায়ের পরিলক্ষিত হয় এবং তার মাধ্যমে আমরা দাওয়াতের মূলনীতি উপলব্ধি করতে পারি। সাথে সাথে দায়ীর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। যেমন একজন দায়ী ইল্লাল্লাহ তার স্বজাতিকে, গোত্র ও পরিবারের লোকদেরকে, কিংবা আপন প্রিয়জনকে কিভাবে সম্বোধন করবে, প্রতিপক্ষ কিংবা শত্রুকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে হলে কি পন্থা অবলম্বন করবে। হযরত মুসা আঃ এর দাওয়াতের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে যে কথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে যায় তা হল একজন দায়ী সর্বাবস্থায় দায়ী হিসেবে থাকবে, চাই সে কোন প্রতিপক্ষ শত্রুকে সম্বোধন করুক কিংবা কোনো সগোত্রিয় বন্ধুকে, দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে এবং দায়ীর গুণাবলী ও চরিত্র তার মধ্যে প্রতিভাত হতে থাকবে। প্রেক্ষাপট যাই হোক এবং সম্মোধিত বইটি যে কেউ হন না কেন, দায়ীর আচরণ , উচ্চারণ ও ভাষা হবে দাওয়াতের আচরণ উচ্চারণ ও ভাষা। দাওয়াহ হবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। দাওয়াতের গুন সর্বদা তার থেকে মুখরিত হতে থাকবে । দাওয়াত পদ্ধতি যাই হোক না কেন তার একমাত্র লক্ষ্য থাকবে কিভাবে দাওয়াতের বাণী হৃদয়ের মনি কোঠায় পৌঁছে দেওয়া যায় এবং কিভাবে মানুষকে হক ও সত্য গ্রহণে প্রস্তুত করা যায়। দাওয়াতের উপর পরিপন্থী যে কোন আচরণ ও উচ্চারণ পরিহার করে চলাই একজন দায়ী র আদর্শ হবে। হযরত মুসা আ এর উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তৎকালীন চরম প্রতিকূল প্রেক্ষাপট , পারিপার্শ্বিকতার কারণে পালন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল । উপরন্তু

তিনি যে প্রতিকুল অবস্থা ও পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন , তা তার এই দায়িত্ব পালনে কঠিনতর মাত্রা আর ও তিব্রতর করে দিয়েছিল ।

হযরত মুসা আলাই সাল্লাম বনি ইসরাইলকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে যাত্রা শুরু করলেন । মিশরের উত্তরপূর্ব সীমান্ত হতে আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির মাঝখান দিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার মাঝে সংযোগ সৃষ্টিকারী একটি স্থল পথ ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে হযরত মুসা আলাই সালাম পথ ভুল করে ফেললেন । এই ভুল কোন ভুলক্রমে ছিল না বরং তা ছিল মহান আল্লাহর পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত । তাই তিনি স্থলপথের পরিবর্তে সামুদ্রিক পথ অনুসরণ করে রাতের অন্ধকারে কোথা হতে কোথায় গিয়ে পৌঁছলেন তার খবর ছিল না । যখন ভোরের আলো উদ্ভূত হলো তখন দেখলেন সামনে লোহিত সাগর এবং পিছনেফেরাউন ও তার বিশাল সেনাবাহিনী । বনি ইসরাইল চিৎকার করে উঠল , এখন কি উপায়? হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল । তারা বলতে লাগলো মুসা আমাদেরকে এমন জায়গায় উপস্থিত করেছ, যেখানে সামনে লোহিত সাগর পেছনে শত্রু বাহিনী। সামনে অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই, পেছনে যাওয়ার উপায় নেই। এ অবস্থায় হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ইসলামের দাওয়াতি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । কোরআন করিমে এ ঘটনাকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ,অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

(সূরা শুয়ারা আয়াত ৬১)

এখানে কোন রাজনৈতিক নেতা হলে তার জবাব হতো , আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সম্পূর্ণ সঠিকভাবে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছি। অবশ্যই সফলতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত মহান নবী হযরত মুসা আঃ জবাব দিলেন كلا ان معي ربي سيهدين কখনোই নয় , আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক । সত্তর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন । (সূরা শুয়ারা আয়াত ৬২)

পরিপূর্ণ আস্তা ও বিশ্বাসের সাথে তিনি এ জবাব দিয়েছিলেন । তার জবাবের প্রতিটি শব্দ, কথা প্রমাণ করে এমন কঠিন বিপদ সংকটের মুহূর্তেও তিনি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন এই রাত্রিকালীন যাত্রা মহান আল্লাহর ইচ্ছাই হয়েছে। যিনি তার বান্দাদেরকে কখনো বিপথগামী করেন না এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না সুতরাং উত্তাল সমুদ্র কিংবা ফেরাউনের সৈন্যবাহিনীকে কিসের ভয়? আল্লাহ তাআলা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে দুশমনের হাতে ছেড়ে দিবেন?

এটা তার দয়া ও অনুগ্রহের পরিপন্থী । এটাতো কোন ন্যায়পরায়ণ শাসক, কোন স্নেহশীল পিতা, এমনকি কোন সুসভ্য ব্যক্তির কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না।সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরিস্থিতি বড় ভয়াবহ ও বিপদজনক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তাছাড়া, তিনি ছিলেন একজন সত্য নবী। যখন প্রতিটি জিনিস আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, সমগ্র বিশ্বজগৎ তার কর্তৃত্বাধীন । সুতরাং ভীত ও আতঙ্কিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? মুসা আলাইহিস সালাম পরিপূর্ণ আস্তা ও বিশ্বাসের সাথে বললেন কিছুতেই নয় ,আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন। তিনি অবশ্যই আমাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন। কুরআনুল করিমে বর্ণিত এই ঘটনাটিকে শুধু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর ঘটনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তার ঘটনা পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ,

ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا

অর্থ: “সে ছিল দুজনের দ্বিতীয় জন । যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।”
(সুরা তওবা আয়াত ৪০)

এই ঘটনা প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী অন্যান্য সিরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইসলাম যখন সাওর গুহায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ সহ অবস্থান করছিলেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সেখানে মুশরিকদের উপস্থিতি অনুভব করে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের কেউ নিচের দিকে লক্ষ্য করলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন , এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কিসের ভয় যাদের সাথে তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ ।

হযরত শোয়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ

হযরত ছোঁয়াইব আলাইহিস সাল্লাম হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি সিনাই পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্বে লোহিত সাগরের অববাহিকায় অবস্থিত মাদাইনে প্রেরিত হয়েছিলেন। মিশর থেকে হিজরত করে হযরত মুসা আলাই সালাম ১০ বছর তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তার কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল । মাদায়েনের অধিবাসী লোকেরা অন্যান্য অনেক পাপ কাজের সঙ্গে , বিশেষভাবে ওজনে কম বেশি করার পাপে অভ্যস্ত ছিল তাদের সবাই । এর দাওয়াত ও এই বিশেষ পাপ সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যনির্দেশিত ছিলেন ।তাই তার দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহতালা বলেন:

والى مدينه اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقص المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويقوم او فو المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ض

অর্থ: "মাদায়েন বাসির কাছে আমি তাদের ভাই শোয়াইব কে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। মাপে ও ওজনে কম করো না ।আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি। কিন্তু, তোমাদের জন্য আমি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। হে আমার জাতি তোমরা ন্যায় সঙ্গত ভাবে মেপো ও ওজন কর । লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। যদি তোমরা মুমিন হও । তাহলে আল্লাহ অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।"

(সূরা হুদ ৮৫ ৮৬)

হযরত সোয়াইব আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতের পর তাঁর জাতির লোকেরা কি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, এবং সে প্রেক্ষিতে নবী কি কি কথা বলেছেন ,ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন , সে সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে কোরআন মাজিদে । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنتم على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قام الصالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود

অর্থ: তারা বলল, হে শোয়াইব তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার এবাদত করত, আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি তো অবশ্যই সত্যিকার অর্থে ভালো মানুষ। শুয়াইব বলল, হে আমার জাতি! তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আমি যদি আমার রবের প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তার কাছ থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করে থাকেন তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকবো? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি , আমি নিজের তা করতে ইচ্ছা করি না । আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই । আমার কাজ সম্পন্ন হয় তো আল্লাহর সাহায্যে; আমি তারই উপর নির্ভর করি এবং তারই অভিমুখী। হে আমার জাতি ! আমার সঙ্গে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় - যাতে তোমাদের উপর তার অনুরুপ বিপদ আপতিত হয় । যা

আপতিত হয়েছিল হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের জাতির উপর কিংবা সালেহের জাতির উপর; আর লুতের জাতি তো তোমাদের কাছ থেকে দূরে নয় । তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর । আমার রব তো পরম দয়ালু, প্রেমময় ।

(সূরা হুদ,৮৭-৯০)

এভাবে শোয়াইব আলাইহিস সালাম তার জাতির লোকদের কাছে অবিরাম দেওয়া দেয়ার কাজ চালিয়ে যান।

আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব আলাইহি সাল্লাম এর দাওয়াহ

আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব আলাইহি সাল্লাম উত্তর পূর্ব আরবের একজন বিত্তবান লোক ছিলেন। তার অর্থ-সম্পদ ও অনুগত লোকজন ছিল অনেক । পরবর্তীতে তিনি নানা বিপর্যয়ের শিকার হন । তার পশুপাল মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায়। চাকর বাকর শত্রুদের হাতে নিহত হয়। পরিবারের লোকেরা গৃহধবসে মারা যায়। নিজে দূরেরোগ্য রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন ।এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুলে অবিচল থাকেন। পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেই পুরস্কৃত করেন। আগের চেয়ে দ্বিগুণ সমৃদ্ধি তাকে দেওয়া হয়। তাকে সাত ছেলে ও তিন মেয়ে দেয়া হয় । তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। দীর্ঘ রোগভোগ এবং সর্বহারা অবস্থায় দিনাতিপাতের সময়ও তিনি আল্লাহতালার কাছে যে মুনাজাত করেন তা তার দাওয়াতী কাজেরই অংশবিশ্বাস ।কুরআন মজিদে এর বিবরণ পাওয়া যায় ।

যেমন :

وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين

“আইয়ুব যখন তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, দুঃখ-কষ্ট আমাকে জর্জরিত করেছে, আপনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।” (সূরা আম্বিয়া আয়াত - ৮৩)

তার ধৈর্যশীলতার প্রশংসা করে আল্লাহতালা বলেছেন,

انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب

“নিশ্চয়ই আমি আইয়ুবকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে পেয়েছি কতই না উত্তম বান্দা ছিল সে নিশ্চয় সে ছিল আমার অভিমুখী । (সূরা সোয়াদ 44 আয়াত)

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দাওয়াত

খ্রিস্টপূর্ব ১১ শতকে হযরত শামুয়েল বা সামাউন আঃ নামে একজন নবী ছিলেন। যিনি ইসরাইল জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন । তার সময়ে ইসরাইল জাতি নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্তির কারণে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে আমালিকা ও মিডিয়ানিদের হাতে পরাজিত হয়। বিশেষত আমালিকা শাসক জালুত তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু করে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর ইসরাইল জাতির নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন যশোয়া। এ সময় তারা জর্দানের সীমানা অতিক্রম করে পুনরায় ফিলিস্তিনের বসবাস শুরু করেছিল । কিন্তু সামুয়েল আঃ সালামের সময় অনৈক্য ও বিভক্তির কারণে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেদের দুরবস্থার দূর করার জন্য তারা নবীর কাছে এমন একজন শাসক প্রার্থনা করে , যে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী করতে পারবে। নবী তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ছোট ভাই বেনিয়ামিনের গোত্রের তালুতকে তাদের বাদশা মনোনীত করলেন। তালুত যাবেন জালুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিন্তু ইসরাইল জাতি তাদের ঐতিহ্য অনুসারে তালুতের অবাধ্যতা করে। তারা অধিকাংশই যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে। এ অবস্থায় তালুতের সঙ্গে এক অখ্যাত মেষপালক যুদ্ধে অংশ নেয়, সে এমনি অখ্যাত যে যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার ও জানতো না। নিজের সঙ্গে ছোট আকৃতির কিছু পাথর নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অক্ষত এই মেষপালক যোদ্ধাই তার পাথর দিয়ে জালুতকে ধরাশায়ী করা এবং হত্যা করে। তালুত ঘোষণা করেছিল, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করবে তার সঙ্গে তিনি আসসালামু আলাইকুম কন্যার বিয়ে দিবেন এবং তাকে বাদশাহীর অংশীদার বানাবেন। ফলে অখ্যাত মেষশাবক রাতারাতী শাসকে পরিণত হলেন । এই অখ্যাত যোদ্ধা বা মেষপালকই হলেন হযরত দাউদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি একজন অন্যতম রাসুল ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে যাবুর কিতাব দান করেছিলেন আল্লাহ বলেন:

واعطينا داوود زبوره

অর্থ :আর আমি দাউদকে যাবুর দান করেছিলাম। (সূরা নিসা, আয়াত -১৬৩)

তিনি মিষ্টি কণ্ঠে যাবুর তেলাওয়াতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুরআন মজিদের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় পাহাড় ও বৃক্ষকুলকে আল্লাহতালা দাউদ আলাই সালাম এর অনুগত করে দিয়েছিলেন।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭৯, সূরা সাবা, ,আয়াত ১০)

তিনি তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে দীনি দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াহ

তিনি ছিলেন হযরত দাউদ আলাই সালাম এর পুত্র। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৯৯০ থেকে ৯৩০ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে রাজত্ব করেন। পিতা ও নানা সূত্রে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। ইসরাইলের সব শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রাজা ছিলেন এবং নবী ছিলেন। উদ্দাম বায়ু, পাখপাখালী, জিন ইত্যাদিকে আল্লাহ তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। তাকে দান করা হয়েছিল সবার ভাষা বোঝার ক্ষমতা। দ্বীনি দাওয়াহ কে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এ কারণেই দেশে-বিদেশের দাওয়াহ প্রেরণ করেছেন।তার দাওয়াহ প্রদানের বিষয়ে কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সুবিচারক হিসেবে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। আল্লাতালার কাছে তার সুউচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وان له عندنا زلفه وحسن ماب

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার কাছে সুলাইমানের জন্য নৈকট্যের মর্যাদার হয়েছে এবং আছে সুন্দরতম পরিণাম।

(সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৪০।)

হযরত ইলিয়াস আলাইহি সাল্লামেরওয়াদাওয়াত

খ্রিস্টপূর্ব ৬৯৬- ৮৭২ সালের মধ্যে সুমারিও রাজবংশ আহাব ও আহাবিয়া রাজাদের সময় তাদের বেদুইন লোকদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম। বাইবেলে তাকে ইলিজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে মরুচারীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা বাআল নামক এক সূর্য দেবতার পূজা করত। সিরিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে তখন এর পূজার প্রচলন ছিল। তিনি তাদের এই শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য দাওয়াহ প্রদান করেন। সূরা সাফাতের আয়াতে দাওয়াতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

অর্থ : নিশ্চয়ই ইলিয়াস রাসূলদের একজন ছিলেন। যখন তিনি তার জাতির লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না ? তোমরা কি বাআল দেবতার পূজা করবে এবং পরিত্যাগ করবে সুন্দরতম , শ্রেষ্ঠতম মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। কিন্তু তারা ইলিয়াসকে মিথ্যা মনে করেছিল। যে কারণে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। তবে যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা, তাদেরকে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে না। আমি তাকে পরবর্তীকালে লোকদের জন্য স্মরণীয় করে রেখেছি।
(সূরা সাফফাত ১৩৩ - ২৯)

হযরত ইল ইয়াসিন এর দাওয়াহ

তার মতে এটি হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের নামের বিকল্প উচ্চারণ। কেউ কেউ একে ইলিয়াস নামের বহুবচন হিসেবে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এটি বহুবচন হয়, তাহলে এর অর্থ হবে ইলিয়াসের মতো যারা তারা। কোরআন মজিদে তার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

سلام على ال ياسين انا كذلك نجزي المحسنين

অর্থ: "ইল ইয়াসিনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই এভাবেই আমি সৎকর্মশীল লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার
মুমিন বান্দাদের অন্যতম একজন।"
(সূরা সাফফাত ১২৩- ১৩২)

হযরত আল ইয়াসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াহ

তিনি হযরত ইলিয়াস আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে স্থলাভিষিক্ত হন। বাইবেলে তাকে এলিশা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মজিদে তাকে একবার হযরত ইসমাইল, হযরত ইউনুস, হযরত লুত আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে এবং একবার হযরত ইসমাইল হযরত জুলকিফল এর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনআমের ৮৬ ও সূরা সাফাতের ৪৮ নম্বর আয়াতে তার নাম উল্লেখ আছে। তিনি কোথায় প্রেরিত হয়েছেন বা কিভাবে দাওয়া প্রদান করেছেন কিংবা দাওয়াতি কাজে তার কি কি প্রতিবন্ধকতা ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

হযরত উজায়ের আঃ এর দাওয়াহ

বাইবেলে তিনি অ্যাজ্রা নামে খ্যাত। ইহুদীরা তাকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে । তাদের মধ্যে উজাইরিয়া নামে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । খ্রিস্টানরা আল্লাহর পুত্র মনে করে হযরত ঈসা আঃ কে , এই দুই সম্প্রদায়ের ধারণার কথা উল্লেখ করার জন্য কুরআন মজিদের সূরা তওবায় একবারই হযরত উজাইর আঃ এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وقالت اليهود عزير ابن الله

অর্থ: ইহুদীরা বলে উজায়ের আল্লাহর পুত্র ।
(সূরা তাওবা, আয়াত ৩০)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দাওয়াহ

তিনি ইউনুস, জুন ও শাহিবুল হুত নামে খ্যাত। আল কুরআনে এ তিন নামেই তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নিনোয়ার অধিবাসীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন । এটি আশিরীয়দের একটি সমৃদ্ধশালী শহর এবং রাজধানী ছিল। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বাগদাদের ২৩০ মাইল উত্তরে দজলা নদীর তীরে মোসেল শহরে মুসলমানের নিকটবর্তী এলাকায় এর অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এখানে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কবর বিদ্যমান, যা তার নাম ফলক দিয়ে চিহ্নিত রয়েছে। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وان يونس من المرسلين

অর্থ: নিশ্চয়ই ইউনুস রাসুলগণের অন্যতম একজন ছিলেন । (সূরা সাফফাত -149)

তিনি দীর্ঘকাল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে দ্বীনের দেওয়া প্রদান করেন কিন্তু তারা কুফরি অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত তাদের অব্যাহত অবাধ্যতার জন্য তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিলের উপক্রম হয়। তিনি গজব নাযিলের আগে এলাকা ছেড়ে চলে যান । ইতিমধ্যে গজবের আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তিনি তখন

জাহাজে। এ অবস্থায় নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্র নিক্ষিপ্ত হন। আল্লাহর হুকুমে একটি মাছের পেটে তার আশ্রয় হয়, এরপর তিনি কিছুদিন সমুদ্রের একটি দ্বীপে থাকেন এবং পরবর্তীতে দ্বীন গ্রহণকারী উম্মতের মধ্যে ফিরে আসেন। কুরআন মজিদের ১০ম সূরাটি তার নামে নামকরণকৃত এবং এ সূরায় তার ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়াও সূরা আম্বিয়া এর ৮৭- ৮৮, সূরা নিসার ১৬২, সূরা আনআমের ৬৬- ৮৬, এবং সূরা সাফফাত এর ১৫৯ ও সূরা আল কালামের ৪৮-৫০ নম্বরে এ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়।

হযরত জাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াহ

জাকারিয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান সেবক ছিলেন । তার স্ত্রী ইলিশা বা এলিজাবেথ ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মরিয়ম আলাইহিস সালামের চাচাতো বোন। এদিক দিয়ে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সাল্লাম এর পুত্র হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সাল্লাম, হযরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালাতো ভাই ছিলেন । জাকারিয়া আলাইসালাম এর স্ত্রী ইলিশাবাহ ছিলেন হযরত হারুন আলাইসাল্লাম এর অদস্তন পুরুষের কন্যা । ঈসা আঃ এর মা মারিয়াম ছিলেন ইমরানের কন্যা। হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পিতার নামও ইমরান ছিল । তবে এই দুই ইমরান এক ছিলেন না এবং তাদের মাঝে সময়েরও ব্যবধান ছিল বিপুল। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাস এর প্রধান সেবক হিসেবে এ ঘরের জন্য উৎসর্গ কৃত ইমরান- হান্না দম্পত্তির মেয়ে সন্তান মারিয়ামের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । এজন্য অবশ্য লটারির আয়োজন করা হয়েছিল। এখানেই মারিয়াম আলাইহিস সালামের মধ্যে নানা অলৌকিকতা প্রকাশিত হয়। সবশেষে তিনি সন্তান সম্ভবা হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করেন। জাকারিয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন । হযরত মরিয়ম আলাইহিস সাল্লাম এর মতো, অনন্য একটি কন্যা, তার মধ্যে পিতৃত্বের আগ্রহ তৈরি করে। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং
তাকে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সাল্লাম কে পুত্র হিসেবে দান করেন । সূরা আল ইমরানের ৩৯-৪০, সূরা মারিয়ামের ২১৫ এবং সূরা আম্বিয়ার ৮৯ - ৯০ আয়াতে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সাল্লাম এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ্

হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর অলৌকিক সন্তান, আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম মোজেজা, হযরত ইয়াহিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম । সূরা মারিয়াম এর ৭-১৫ এবং সূরা আম্বিয়ার ৮৯-

৯০ আয়াতে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । বাইবেলে তাকে জন দি ব্যাপ্টিস্ট নামে অধিক অভিহিত করা হয়েছে । তিনি সাহসিকতার সঙ্গে দ্বীনের দাওয়াহ্ প্রদান করেন এবং রুমক শাসক হেরোডের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ কারণে সম্রাটের নির্দেশে খুব অল্প বয়সে তার শিরচ্ছেদ করা হয়।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর দাওয়াহ্

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সবচেয়ে নিকটতম, পূর্ববর্তী রাসূল হলেন ঈসা আঃ। তিনি সমকালীন বিশ্বের সব মানুষ বিশেষত ইসরাইল জাতির কাছে প্রেরীত হয়েছিলেন। নিতান্তই শৈশব থেকে তিনি দাওয়াতে দ্বীনের কাজ শুরু করেন । কোরআন মজিদে তার দাওয়াতি কাজের বিবরণ দিয়ে এরশাদ হয়েছে-

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا

অর্থ : "এরপর মারিয়াম তার সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করল, তারা বলল যে, কোলের শিশু, তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব।কোলের শিশু বলল, আমি তো আল্লাহর দাস, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত, যাকাত আদায় করতে। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্দত ও হতভাগ্য করেননি।"
(সূরা মারিয়াম, ২৯ -৩২)

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

অর্থ : ইসা যখন স্পষ্ট নিদর্শন সহ আসলো, তখন সে বলেছিল, আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ কর। আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তোমরা তার এবাদত কর। এটাই সরল পথ।(সূরা যুখরুফ আয়াত ৬৩-৬৪)

উল্লেখিত নবী-রাসূল ছাড়া আরও যাদের কথা কোরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তাদের সবাই এক ও অভিন্ন বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন, আর তা হলো আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত। তারা সবাই সমকালীন লোকদের কাছে সাধারণভাবে এ আহ্বান রেখেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। কাজেই এবাদত, আনুগত্য ,হুকুম মানা, সবকিছু কেবল আল্লাহরই হতে হবে। সাধারণভাবে সব নবী রাসুল তাদের এই দাওয়াহ নির্বিঘ্নে দান করতে পারেননি । সবাইকে শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে দাওয়াতি কাজ

চালিয়ে যেতে হয়েছে এবং কোন প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে দমিয়ে রাখতে বা দাওয়াহ্ থেকে বিরত রাখতে পারেনি । শত নির্যাতন সহ্য করে ,এমনকি কেউ কেউ জীবনের কোরবানি পেশ করেও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

অর্থ:" তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছিল। তাদের এ অবস্থার কারণ এটাও যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। (সূরা আল, ইমরান **১১২**)

قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد

অর্থ: " অগ্নিকুণ্ডের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে , যে অগ্নিকুণ্ডে ছিল অনেক জ্বালানির আগুন, যখন তারা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ছিল। আর তারা মুমিনদের সঙ্গে যে আচরণ করছিল তা দেখছিল । তারা তো মুমিনদেরকে নির্যাতন করছিল, কেবল এই কারণে যে, তারা মহা শক্তিশালী ও মহা প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।
(সূরা বুরুজ আয়াত ৪-৮)

নবী রাসুল এবং দায়ীগণের এভাবে নির্যাতন সহ্য করে দাওয়াতী কাজ মহানবী হযরত মুহাম্মদকরার কারণ হলো, "এটি ইসলামের প্রাণ।" এছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াহ্

হযরত মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসূল। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতের যে ধারা সূচিত হয়েছে , হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম সে

ধারার পূর্ণতা সাধন করেছেন । বস্তুত রাসুল সাঃ এর গোটা জীবন ইসলামী দাওয়াতের এক বিমুর্ত নির্দেশনা । ইসলামি দাওয়াতের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও রূপায়িত বাস্তব অবস্থা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইসলামের জীবনে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল । তার দেখানো পথে, তার অনুসারী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গন, তাদের জীবন, অর্থ-সম্পদ ও সব সম্ভাবনা, দাওয়াতের পথে কুরবানী করে দিয়েছিলেন ,

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর আগে যেসব নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার এ মহতি কাজে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম আলাই সাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জাহানে, নবী রাসুল প্রেরণের যে ধারার সূচনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হলেন তার সর্বশেষ সীমা। তার মাধ্যমে পৃথিবীর সব কাল ও যুগের মানুষের জন্য প্রেরিত, আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামও পূর্ণতা লাভ করে। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবতা ও মানব সভ্যতার চরম সংকট সন্ধিক্ষণে । আর অসাধারণ প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় মানবতার চরম বিপর্যয় রোধ করতে সমর্থ্য হয়েছিলেন। বিশ্ব জাহানে মানুষের জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর আবির্ভাব সর্বাধিক তাৎপর্যবাহ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। হযরত রাসুল সাঃ দাওয়াতী কাজ শুরু করার পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা প্রতিটি পদক্ষেপে তার শতভাগ অনুসরণ করেন, তাদের আন্তরিকতা, ঈমান, নিষ্ঠা ও আনুগত্য এতটাই প্রবল ছিল যে কুরআন মজিদে

আল্লাহতালা ঘোষণা করেছেন:

رضي الله عنهم ورضوا عنه

অর্থ: আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত ।

(সূরা বাইয়েনাহ আয়াত ৮)

প্রথমত: রাসুল সাঃ এর আবির্ভাব, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এক অভিনব ও অসাধারণ অধ্যায় রচনা করেছিল, যে জাতি যুগ যুগ ধরে অজ্ঞাত, অখ্যাত, অবহেলিত জাতি হিসেবে দুস্তর আরব মরুভূমির বুকে ম্রিয়মান ছিল, আত্মঘাতী অন্তরদ্বন্দ্বে যে জাতি ধ্বংসের কবলে নিপতিত ছিল, যে জাতির লোক, পৌত্তলিকতার ছত্রছায়ায়, নৈতিকতা বিবর্জিত পশুত্বের নিম্নস্তরে নেমে এসেছিল, সে জাতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সান্নিধ্যে এসে, এক অতি

পরাক্রমশালী তৌহিদবাদী, সুসভ্য , সুসংহত, সুমার্জিত এবং মহান দিগ্বিজয়ী জাতি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ্য হয়েছিল ইতিহাসবিদগণ পর্যন্ত বিষয়টিকে অলৌকিক আখ্যা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ পাননি।

দ্বিতীয়তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মতৎপরতা কেবল আরব উপদ্বীপে এই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর তৎপরতার পরিধি ছিল বিশ্বজগৎ বিশ্ববাসীর এবং পরকালীন সামাজিক কল্যাণ সাধনে ছিল তার রিসালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মানব কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তার আগে অনেক নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছিলেন তবে তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে ,আল্লার বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু রাসুল সাঃ ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন । যে কারণে তিনি বিশ্বনবী। তার বিপুল দায়িত্ব, বিশাল কর্মক্ষেত্রের কথা কোরআন মাজিদে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে

যেমন :

وما ارسلنا ك الا رحمه للعالمين

অর্থ: আমি আপনাকে বিশ্বজগতে প্রতি কেবল রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া ১০৭)

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

অর্থ: কত মহান তিনি, যিনি তার বান্দা মুহাম্মদের প্রতি ফুরকান বা সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার গ্রন্থ নাজিল করেছেন,। যাতে সে বিশ্ব জাহানের জন্য সতর্ককারী হতে পারে ।

(সূরা ফুরকান ১)

وما ارسلناك الا كفات للناس بشيرا ونذيرا ولكن

اكثر الناس لا يعلمون

আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি ।

(সূরা সাবা আয়াত ২৮)

ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايات من ربه انما انت ممزع ولكل قوم هاد

অর্থ : যারা কুফরি করেছে তারা বলে,

তার রবের কাছ থেকে, তার কাছে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?, তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির জন্যআছেপথপ্রদর্শক।

(সূরা রাদ আয়াত আয়াত ৭)

قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله رسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون

অর্থ: বল হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূল। যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তার উম্মি বার্তাবাহকের প্রতি যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ করে যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।(সুরা আরাফ আয়াত ১৫৮)

তৃতীয়তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচারে, এক নিবেদিত প্রাণ মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বজাহানে আল্লাহতালার একত্ববাদের বিশ্বাস এবং তার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

ছিল , তার দাওয়াতের মূল কথা। কোরআন মজিদে বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহতালা বলেন,

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم

অর্থ: আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই তিনি চিরঞ্জীব সর্বোত সত্তার ধারক তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করেনা আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তার। কে সে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনেও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তার কুরসি, আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত ।এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি মহান শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা ২৫৫)

شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم

অর্থ :আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। মালাইকা এবং জ্ঞানীরাও। আল্লাহ ন্যায় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।

(সূরা আল ইমরান আয়াত ১৮)

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير انك على كل شيء قدير

অর্থ: বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ । তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর , যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, যাকে ইচ্ছা হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সূরা আল ইমরান আয়াত ২৬)

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

অর্থ : বল , আল্লাহ এক ও একক তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ । তিনি জন্ম দেন না, তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য আর কেউই নেই।

(সূরা ইখলাস আয়াত ১-৪)

চতুর্থত: জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে রাসুল সঃ আল্লাহর সৃষ্ট মানবগোষ্ঠীর রূপকার সাধনে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং নিবেদিত প্রাণ নিয়ে তিনি যে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছেন এবং যে বক্তব্যসমূহ পেশ করেছেন তার সবই ছিল এবাদত। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রকৃত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আবদ বা দাস। তাই জনসেবা তার জীবনের প্রকৃত ব্রত হয়ে উঠেছিল। রাসুলের বিভিন্ন বক্তব্যে সৃষ্টির সেবার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ থেকেই বিষয়টি প্রতিয়মান হয়। যেমন তিনি বলেন,

'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারসরূপ মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এহসান করে।

(মু'জামুল আওসাত লীত তাব্‌রীআইন অধ্যায়)

"তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। যদি সে অত্যাচারী হয়, তাহলে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখো। আর যদি সে অত্যাচারিত হয়, তাহলে তাকে সাহায্য কর। (দারিমী)

"সব মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই । সে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং সে তার ভাইকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর দয়া করো, তাহলে আকাশবাসীরা তোমাদের উপর দয়া করবে।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের উপর দয়া করে না, আল্লাহ তাআলা ও তার উপর দয়া করেন না।(সহীহ মুসলিম , আল ফাজায়েল অধ্যায়)
প্রকৃতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ধ্যান ধারণায় কার্যকলাপে ও কর্মতৎপরতায় বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, জনকল্যাণমূলক সেবা, উদারতা, সহনশীলতা, ন্যায় নীতি, প্রেম ভালবাসা, মহানুভবতা, গণতান্ত্রিকতা ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা, এর বাস্তব প্রতিকৃতি হয়ে উঠেছিলেন।

পঞ্চমত: রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম প্রচারিত ইসলামী জীবন বিধান মানবজাতির জন্য এতই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, এককালে ধূমকেতুর মতো বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্যই ইতিহাসবিদ পি, কে, হিttস্ট্রি মত প্রকাশ করেছেন, আরবদের সৈন্যচালনা ও রাজ্য জয়ের অবসান ঘটেছিল অনেক আগে। যে মুঘল ও তুর্কি জাতির কাছে তাদের শারীরিক পরাজয় ঘটেছিল, তাদের পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহা সত্য, তার সে তাওহীদের বাণী জয় যুক্ত হয়েছিল । আধুনিক বিশ্বে এটা আজ অনস্বীকার্য সত্য যে, ইসলাম আজ মরক্কো থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত একটি জীবন্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষের জীবনধারার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সহজে প্রতিয়মান হয় যে, রাসুল সাঃ এর আবির্ভাব ইতিহাসের সর্বাধিক তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। মূলত তার আবির্ভাব ছাড়া মানবতা ও মানব সভ্যতার সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিল না ।

মক্কায় ইসলামের দাওয়াত

৬১০ খ্রিস্টাব্দে কদরের রাতে ,দীর্ঘ ৪০ বছরের মানসিক, দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহতালার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য ও সুন্দরের বাণী পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্বের নাম নবুওয়াত। স্বাভাবিকভাবেই নবুয়ত লাভের পর রাসুল সঃ ,এর দাওয়াহ দিতে উদ্যোগী হন। অন্যান্য সব নবী রাসূলের মত তার দাওয়াহ দেয়ার কাজও সহজ ছিল না । নানারকম বাধা বিঘ্ন, অত্যাচার নির্যাতন প্রলোভন তার দাওয়াতের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, সব বাধা অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তার দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখেন । নবুয়তের দীর্ঘ ২৩ বছরের প্রথম ১৩ বছর তিনি মক্কায় দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন। এরপরে মদিনায় ১০ বছর অবস্থানকালে তিনি মূলত দাওয়াতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রতিকৃতি গড়ে তোলেন। যে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াহ বলতে

তার কওঁপমক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে ইসলাম প্রচারের বিষয়টি বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়ে থাকে। এখানে পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জীবনের দাওয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

প্রথম নির্দেশ

নবুয়তের প্রথম প্রহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর উপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ আসে।

اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

অর্থ : "পড়, তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ইংলাক থেকে । পড়, তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে- যা সে জানতো না।"

(সূরা আলাক ১-৫।)

কিন্তু আল্লাহর এ নির্দেশনা থেকে রাসূল সালাম তার করণীয় নির্ধারণ করে করতে পারেননি কেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সৃষ্টিকর্তা রবের নাম পাঠ করাই তার একমাত্র দায়িত্ব নয়। তাকে আরো বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে এই নির্দেশগুলো হলো সে দায়িত্বের ভূমিকা মাত্র। কিন্তু সে দায়িত্বের প্রকৃতি ধরন পালন করার পদ্ধতি কেমন হবে সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল ছিলেন না ।এ সম্পর্কে প্রথম নির্দেশ আসে কিছুদিনের মধ্যেই। আল্লাহতালা বলেন,

يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تستكسر ولربك فاصبر

অর্থ: হে কাপড় আচ্ছাদিত ব্যক্তি। উঠ সতর্ক করো এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পবিত্র রাখো। পৌত্তলিকতা পরিহার কর। বেশি পাওয়ার আশায় দান করো না। এবং তোমার রবের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা মুদ্দাসসির আয়াত ১-৭)

এ নির্দেশ আসার পর রাসুল আঃ সুনির্দিষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন যে, তাকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। তার দায়িত্ব মানুষকে অন্যায়, অনাচারের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা। পৌত্তলিকতা বর্জন করা । একনিষ্ঠ ভাবে মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া । যদিও তখন পর্যন্ত তার কাছে পাপ পুণ্যের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পুরাপুরি স্পষ্ট ছিল না । পৌত্তলিকতা বর্জন করে মানুষ কি গ্রহণ করবে, তারও কোন নির্দেশনা ছিল না। তা সত্ত্বেও এই নির্দেশের পর তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

গোপন প্রচার

পবিত্র হওয়া, পত্তলিকতাবর্জন করা এবং একমাত্র রবের প্রশংসা করার দাওয়াত কিভাবে দেওয়া শুরু করবেন, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে আল্লাহতালা নির্দেশনা দিলেন । তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে সতর্ক করো । আল্লাহর এই আদেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতের পথ দেখিয়ে দিল। কেননা নবুয়তের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাম এর সামনে এমন সমস্যা ছিল, এক আল্লাহর বন্দীগী কবুল করার ও অসংখ্য মিথ্যা প্রভুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার দাওয়াহ, সবার আগে কাদেরকে দেয়া যাবে, তা নির্বাচন করা।

দেশ ও জাতির লোকদের তখন যে অবস্থা ছিল তাতে তাদের মেজাজ পছন্দ ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কোন জিনিস পেশ করা বাস্তবে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল, যারা তার স্বভাব চরিত্র , প্রকৃতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন এবং যাদের সঙ্গে তার প্রকৃতই সুসম্পর্ক ছিল। আল্লাহর এই নির্দেশের পর দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি তাদেরকে মনোনীত করলেন। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন বলে তিনি কোন কথা বললে তাকে সরাসরি অস্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন - হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা । এরপর পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা যায় , হযরত আলী , জায়েদ , আবুবকর । আলী রাঃ সাঃ এর চাচাতো ভাই, জায়েদ তার দাস, নস এবং আবু বকর ছিলেন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ।এরা বছরের পর বছর তার সান্নিধ্যে ছিলেন । তাকে অত্যন্ত কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি সবার আগে হাজারা তালাম আনহার কাছে দাওয়াত দিলেন তারপর অবশিষ্ট তিনজনের কাছে দাওয়াত পেশ করলেন ।

এরাই ছিলেন উম্মতের মধ্যে প্রথম ঈমানদার । ঈমানের আলোয় আলোকিত ভাগ্যবান প্রথম কাফেলা। তারা রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর দাওয়াত ও শোনার সঙ্গে সঙ্গে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। কোন রকমের প্রমাণ বিশ্লেষণ বা চিন্তা ভাবনার জন্য সময় গ্রহণ করেননি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কাজেই তা মিথ্যা, অসার বা অর্থহীন হতে পারেনা। এই প্রত্যয় তাদের সবসময়ই ছিল। তিনি দীর্ঘ ৩ বছর প্রায় নির্বিঘ্নে রাসূল সাঃ এর দাওয়াতে দ্বীনের কাজ এভাবে গোপনে পরিচালনা করেন।

এ সময় প্রায় ৩০ জন ভাগ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আমার বিন আমবাসা , খালিদ বিন সাদ , রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধাত্রী উম্মা আয়মান ,ওমর রাঃ এর বোন ফাতেমা, আব্বাসের স্ত্রী উম্মে ফজল, আবু বক্কর রাঃ এর কন্যা আসমা, ওসমান বিন আফফান, ওসমান বিন মাজুন ,জোবায়ের দিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আউফ, তালহা বিন আব্দুল্লাহ, সাদ বিন ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ

রাঃ প্রমুখ। এসব মহাভাগ্যবান লোকদের ইসলাম গ্রহণের নেপথ্যে, ব্যক্তি রাসুল সাঃ এর প্রভাব মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আল কুরআনের প্রভাব

গোপন দাওয়াহ দেওয়ার এ সময়ে কোরআনের যে অংশগুলো নাযিল হয়েছিল, তা ছিল দাওয়াতের প্রথম স্তরের উপযোগী ছোট ছোট বাক্য সম্বলিত। এর ভাষা ছিল অতীব প্রাঞ্জল, ছন্দময় এবং হৃদয়গ্রাহী। এছাড়া এ আয়াতগুলোতে এমন সাহিত্যিক চমক ছিল যে, শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করতো এবং প্রতিটি কথার আবেদন তার বিবেকের কাছে তীরের মত পৌঁছে যেত। যে শুনতো তার মনেই তা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করত এবং তা, বারবার তার আবৃত্তি করার ইচ্ছা জাগত। গোপন দেওয়াতের দিনগুলোতে কোরআনের এ ধারা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দাওয়া কাজেরজন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছিল।

আকিদা-বিশ্বাসের সংশোধন

কুরআন মজিদের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা গুলিতে তাওহীদ ও আখেরাতের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে এমন সব প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছিল , যা প্রতিটি শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল। এসব দলীল-প্রমাণ শ্রোতাদের নিকটতম পরিবেশ থেকেই পেশ করা হচ্ছিল , কথা ও দলিল পেশ করার ভঙ্গি এমন ছিল যে, সে সম্পর্কে শ্রোতারা আগে থেকেই অবহিত ও আগ্রহী ছিল। তাদেরই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহ্যের আলোকে , এসব ঘটনা কথা বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। আকিদা বিশ্বাসের যেসব ভ্রান্তি সম্পর্কে তারা ওয়াকিফাল ছিল সেগুলো সম্পর্কেই আলোচনা করা হচ্ছিল । এ কারণে আল্লাহর কালাম শুনে কেউই প্রভাবিত না হয়ে পারছিল না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম একা গোপনে দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন, কোন মানুষ তার সঙ্গী ছিল না ।দাওয়াতি কাজে তার সঙ্গী ছিল কোরআনের এই আয়াতসমূহ। ফলে গোপনে দাওয়াতের এ কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরভাবে বিস্তার লাভ করে। দাওয়াতের কাজ পরিচালনার জন্য তাওহীদ, আখেরাতের দলিল প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে এ বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তুতি কেমন হতে হবে এবং তার করণীয় কি সে সম্পর্কেও সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

গোপন সালাত

এ পর্যায়ে দাওয়াতের কাজ যেমন গোপন ছিল তেমনি আনুষ্ঠানিক এবাদত ছিল গোপন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক ছাড়া বাইরে কারো কাছে যাতে কিছু ফাঁস হয়ে না যায় সেজন্য সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল । সালাতের সময় হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশেপাশের কোন পাহাড়ের ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন। একবার আলী রাঃ কে নিয়ে নামাজ আদায় করছিলেন, এমন সময় তার চাচা আবু তালেব ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন এবং তাদের এবাদতের নতুন পদ্ধতি দেখে বিস্মিত হন। তাদের সালাত শেষ হলে তিনি জানতে চান এটা কোন ধরনের দীন রসূল সাঃ জবাব দেন, আমাদের দাদা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এর দীন । আবু তালেব বলেন, আমি যদিও এটা গ্রহণ করতে পারছি না, তবে তোমাকে পালন করার অনুমতি দিলাম। কেউ তোমার পথে বাধা দিতে পারবে না।

গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

দাওয়াতে শিক্ষা , অনুসারীদের মনে বদ্ধমূল করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ অমুসলিম নিরক্ষর হওয়ায় তাদেরকে স্বাক্ষর করা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটনোই তার প্রথম কর্তব্য পরিণত হয় । সাহাবী আরকাম রাঃ এর ঘরে, সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তিনি দাওয়াতের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ইতিহাসে এ প্রতিষ্ঠানটি ‘দারুল আরকাম’ নামে খ্যাত হয়।

গোপন দাওয়াত কালীন মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

ইসলামের গোপন দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবন নিয়ে বড় ধরনের বাজিই রেখেছিলেন । গোটা সমাজের সব লোকের চিন্তা ও আদর্শের বিরুদ্ধে তাদের রোষ ও শত্রুতা এবং নৃশংসতার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াহ গ্রহণ করা সহজ বিষয় ছিল না। কাজেই এ যুগে যারা সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন , তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যার ভিত্তিতে তারা এ বিপদসংকুল পথে অগ্রসর হওয়ার সাহস দেখিয়েছেন, এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তারা আগে থেকেই মুশরিকের রীতিনীতি, জীবন পদ্ধতি ও এবাদত বন্দেগীর প্রতি বিতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং মনের ভিতর প্রকৃত সত্যের জন্য এক অন্যরকম অনুসন্ধিৎসা লালন করে আসছিলেন । চরিত্রের দিক দিয়ে তারা সারা আরবে ছিলেন শ্রদ্ধেয়। আইয়ামে জাহিলিয়ার সেই অন্ধকার যুগেও তারা সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

প্রকাশ্য প্রচার

তিন বছর গোপন দাওয়াতের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। বললেন,
"হে রাসুল! তোমার রবের কাছ থেকে যা কিছু তোমার উপর নাযিল হয়, তা প্রচার কর । আল্লাহ তোমাকে মানুষের শত্রুতা থেকে রক্ষা করবেন ।"

আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াতের গোপন অধ্যায়ের অবসান হলো । এরপর থেকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রকাশ্য ধারাবাহিকতা শুরু হলো ।

প্রথম প্রয়াস: প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এক প্রত্যুষে সাফা পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন এবং আরবের প্রচলিত রীতি অনুসারে "ইয়া সাবাহা" বলে লোকদের সম্বোধন করলেন। সমকালীন আরবে এরকম আহবানের অর্থ ছিল কোন বিপদের ঘোষণা । এরকম আহবানের পর লোকেরা আহ্বান কারীর কাছে জমায়েত হত এবং বিপদ সম্পর্কে অবহিত হত। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর আহবানেও তাই আরবের অনেকেই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। রাসুল সাঃ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে করে বললেন, হে লোকেরা আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের পিছনে বিরাট এক শত্রু দল তোমাদের উপর হামলা চালানোর জন্য ওৎ পেতে আছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে ? তারা বলল , 'নিশ্চয়ই করব। কেননা, তুমি তো কখনো মিথ্যা বলোনি। আমরা তোমাকে সাদিক এবং আমিন বলেই জানি ।' রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন - তাহলে শুনো, আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর এবাদতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং মূর্তি পূজার খারাপ পরিণতি থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে চাচ্ছি। তোমরা যদি আমার কথা না মানো তাহলে তোমাদের এক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।
সমবেত উপস্থিত লোকদের মধ্যে বেশিরভাগই তার কথায় অসন্তুষ্ট হলো। তার চাচা আবু লাহাব বলল এজন্যই কি আমাদেরকে এখানে ডেকে এনেছিস।
(সহিহ বুখারী, তাফসীরুল কোরআন অধ্যায়)

এটা ছিল ইসলামের সাধারণ ও প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা ।এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম অত্যন্ত পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন যে, তাকে কি কথা বলার এবং কোন রাজপথের দিকে আহবান জানানোর দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন ,এ বিশাল বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । মানুষের মর্যাদা এই যে, সে এক আল্লাহর বান্দা ও দাস। তার আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা তাদের জন্য ফরজ । তিনি ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করার অথবা তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা তার দেয়া মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কাজ। প্রকৃতপক্ষে এই এক আল্লাহই মানুষ এবং তামাম জাহানের স্রষ্টা, মাবুদ ও শাসক। তার এ সাম্রাজ্যের ভেতর মানুষ আর কারো দাস নয় , আর কারো হুকুম মানতে বাধ্য নয়। মানুষের কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অনুগত্য, বন্দেগী, পূজা, উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়। মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন বটে কিন্তু আসলে দুনিয়ার জীবন একটা পরীক্ষা কাল ছাড়া আর কিছুই নয় । এই পরীক্ষার পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সমস্ত কাজকর্ম যাচাই করে পরীক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ফলাফল ঘোষণা করবেন । এই ঘোষণা কোন মামুলি বিষয় ছিল না। এর ফলে গোটা কোরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের ভিতর আগুন জ্বলে উঠলো এবং সর্বস্তরে বিষয়টি নিয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল।

পারিবারিক নিমন্ত্রণ

প্রকাশ্য দাওয়াহ তো প্রথম দিকে রাসুল সাঃ আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরিদেরকে দিলেন। তিনি আব্দুল মুত্তালিব এর উত্তরসূরিদেরকে তার বাসভবনে আমন্ত্রণ করলেন। এ ভোজ সভায় হামজা, আবু তালিব, আব্বাস সহ আব্দুল মুত্তালিব এর সব বংশ ধরেরা অংশগ্রহণ করলেন। পানাহারের পর রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম সবাইকে সমাগত করে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, আমি এমন একটি জিনিস নিয়ে এসেছি, কে আমার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এটা ছিল কঠিন একটি সময় । চারদিকে শুধু বিরোধিতা আর অসহযোগিতা। কাজেই তাকে সহযোগিতার অর্থ ছিল কেবল দুই একটি গোত্র বা জাতি নয় বরং গোটা আরবের বিরোধিতা, মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকা। সঙ্গে সঙ্গে এজন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে যে, এর বিনিময়ে দুনিয়াতে কিছু নাও পাওয়া যেতে পারে । বরং অমানুষিক নির্যাতন, অপমান, বঞ্চনা সঙ্গী হতে পারে । এজন্য যা কিছু পাওয়ার তা আখেরাতেই পাওয়া যাবে । কাজেই উপস্থিত কেউ আপাত ক্ষতি বিতা নয় রাসূল সঃ এর আহব্বানে সারা দিলেন না বরং তার ঘোষণা ও আবেদন তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল উঠে দাঁড়ালেন কিশোর আলী রাঃ তিনি বললেন আমার চোখে যদিও যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে আমার হাঁটু যদিও অত্যন্ত পাতলা এমনকি

বয়সে যদিও আমি সবার ছোট তা সত্ত্বেও আমি আপনার সহযোগিতা করে যাব। মাত্র ১৩ বছরের বালকের পক্ষ থেকে এমন একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা আব্দুল মুত্তালিবের অবশিষ্ট সদস্যদের বিস্মিত করল কিন্তু তারা কেউই তার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করলেন না।

দাওয়াতের বিরোধিতা করে বনু হাসিম ও মুতালিব বংশের কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াতের সহযোগিতা করার আশ্বাস না দিলেও তিনি দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন না গোপন দাওয়াতের সময় যে ৩০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন প্রকাশ্য দেওয়া শুরু করার পর সে সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল চল্লিশে এরপর রাসুলুল্লাহ সাঃ একদিন কাবায় গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তারপর আরবের মুশরিকদের অত্যন্ত খারাপ ধরনের অপমান তারা এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর উপর বিভিন্ন দিক থেকে হামলা চালানো হলো হযরত হাদিস লালা রাঃ কে সাহায্য করার জন্য ছুটে গেলেন কিন্তু চারদিকের মার মুখে লোকের এলোমেলো হামলায় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াতকে সফল করার জন্য প্রথম রক্ত ঝরলো তার রাসুলুল্লাহ সাঃ নিরাপদেই থাকলেন এবং হামলাও মিটে গেল কিন্তু বিরোধীতা মিটলো না বরং এ সময় থেকে রাসুল সাঃ এর দাওয়াতের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধে শুরু হলো

বিরোধিতার কারণ

দুষকর্মের সিপাহশালার ইবলিশের প্রত্যক্ষ মদদে আবহমান কাল থেকে বাতিল শক্তি হককে নির্মূল করার বা দমিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে তাই সত্য মিথ্যা পৃথিবীরশাশ্বতইতিহাস।

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করার পরও তার ব্যতিক্রম হলো না সমাজের প্রায় সব পর্যায়ে থেকে এর বিরোধিতা শুরু হলো কোরআন হাদিসের বর্ণনা এবং সমকালীন প্রেক্ষিতে বিবেচনা করে রাসুল সাঃ এর বিরোধিতার অনেক কারণ নির্ধারণ করেছেন,

1. ধর্মীয় পার্থক্য
2. আরবদের বদ্ধমূল ধারণা
3. আরবদের বিবেচনায় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা যোগ্যতার অভাব
4. ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সামঞ্জস্য
5. সমাজ সংস্কার
6. নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা
7. ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

8. মুসলিমদের মনোবল
9. মারাত্মক চরিত্রহীনতা
10. জন্মগত কৌলিন্য ও বংশীয় আভিজাত্য ধ্বংসের আশঙ্কা
11. গোত্রগত শত্রুতা ও রেষারেষি
12. প্রবাসে আশ্রয় লাভ
13. অর্থনৈতিক কারণ
14. অতি মানবিক ধারণা
15. শিরকের নিন্দাবাদ
16. বহুত্ববাদের ধারণা
17. অশিক্ষার অভিশাপ
18. দার্শনিক কারণ
19. রাজনৈতিক কারণ
20. বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ
21. ইতিহাসের ধারা

মুসলিম নির্যাতন

রসুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরবদের সব ধরনের বিরোধিতা উপেক্ষা করে তার দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন এতে তারা আরো ক্ষিপ্ত হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম সহ তার অনুসারীদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়।

ইয়াসসির পরিবারের উপর নির্যাতন

ক্রীতদাসীআসির তার স্ত্রী সুমাইয়া এবং তাদের সন্তান আম্মার রাঃ ইসলাম গ্রহণ করলে আরবের লোকেরা তাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালায় তাদেরকে মৃত্যু অথবা ইসলাম ত্যাগ এই দুইটির যেকোনো একটি বেছে নিতে বলা হলে তারা মৃত্যুই বেছে নেন। নানা রকম শারীরিক নির্যাতনের পর কোন ভাবেই তাদেরকে ইসলামচ্যুত না পেরে আবু জাহেল সুমাইয়া রাঃ কে বর্ষা নিক্ষেপ করে শহীদ করেন

তার মৃত্যু কাফেরদেরকে নির্যাতনে নিবৃত্ত করে না বরং তারা আর উৎসাহিত হয় স্ত্রীর মৃত্যুকে ভীত সন্ত্রস্ত বা ইসলাম থেকে আগ্রহী করে না তিনি বরং আরো বেশি দৃঢ়তা ইসলামকে আঁকড়ে ধরেন এমনকি ছোট্ট আম্মার পর্যন্ত পর্বতম দৃঢ়তা রাসুল সাঃ এর দাওয়াত এর উপর অটল থাকেন কাফের রাতে আরো ক্ষুব্ধ হয় তারা পিতা পুত্রের উপর অমানুষিক নির্যাতন

চালাতে থাকে তাদের যন্ত্রণাদ্বন্দ্ব নিপীড়ন জীবন দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এরশাদ করেন তোমাদের বাসস্থান হল জান্নাত এরপর শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত বেলাল রাঃ এর উপর নির্যাতন

খালফের কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস ছিলেন হযরত বেলাল রাঃ শোনার পর তিনি তা গ্রহণ করেন এই কারণে উমাইয়া তার উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং তার উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে তাকে ভাত হার গরম বালির উপর বুকে পাথর চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য করে চাবুক আর বেতের আঘাতে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয় গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাকে টেনে নেয়া হয় নির্যাতনের বেশিরভাগ সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন যতক্ষণ জ্ঞান থাকতো তিনি পাসফুট কণ্ঠে আহাদ আহাদ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াতের সত্যতা ঘোষণা দিতেন বিষয়টি উমাইয়া ও তার কাফির সংগীদের জন্য অনেক বেশি অপমান করছিল শত নির্যাতনেও তারা বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার সংকল্প থেকে একবিন্দুও টলাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত তাকে আবু বকর রাঃ অনেক অর্থ ব্যয়ে মুক্ত করেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর নির্যাতন

ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই উসমান রাঃ ছিলেন বনেদি ঘরের ধনী মানুষ অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেই আরবের তার একটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল তদুপরি তিনি মানুষ হিসেবেও আগে থেকেই বিনয়ী এবং পরোপকারী ছিলেন তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দাওয়াত গ্রহণের পর আরবের কাফেররা তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় এ নির্যাতনে নেতৃত্ব দেন তার চাচা হাকাম হাকাম প্রতিদিন হাত পা বেঁধে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্যাতন করত কিন্তু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নির্বিকার চাচা ও কাফেরদের নির্যাতনের নিয়ে তিনি কোন অভিযোগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং সত্যের পথে থেকে নির্যাতিত হওয়ার জন্য গর্ববোধ করেছেন

হযরত খাববাব রাঃ এর উপর নির্যাতন

রাসুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর দাওয়া গ্রহণের অপরাধী আরবের কাফেররা যাদের উপর নির্যাতন পরিচালনা করছে করেছে তাদের মধ্যে খাব্বাবরা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন ইসলাম থেকে জন্য বিভিন্ন রকম চাপ মারপিট খাবার বন্ধ করে দেয় ইত্যাদি শাস্তির যখন কোন কাজে আসেনি তখন জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপর শুইয়ে দেয়া

হয়েছে তার বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে যেন কয়লা থেকে জিনিস দূরে সরে যেতে না পারেন তার দেহের রক্ত আর চর্বিতে কয়লা নিভে গেছে। আবার নতুনভাবে তাকে নির্যাতনের জন্য আগুনে শুইয়ে দিয়েছে কাফিররা। এ

৫ভাবে নির্যাতনে বারবার জ্ঞান হারিয়েছেন, বারবার পৌছে গেছেন মৃত্যুর দুয়ারে। কিন্তু একবারের জন্যও খাব্বাব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ ত্যাগ করার চিন্তা করেননি।

(রা.)-এর ওপর নির্যাতন: সুমাইয়া (রা.)-এর পর নওমুসলিম নারীদের মধ্যে জিন্নিরা (রা.) সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন। কাফিরদের বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেও তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ বর্জন করেননি, তখন তারা তাঁর দুটো চোখই নষ্ট করে দিয়েছে। আমৃত্যু অন্ধ জিন্নিরা (রা.) চোখের আলোর চেয়ে হিদায়াতের আলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সত্যের পথেই থেকে গিয়েছেন। কোনো নির্যাতনই তাঁকে সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

সুহাইব (রা.)-এর ওপর নির্যাতন:

ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশ কাফিররা শুআইব (রা.)-কে সম্ভাব্য সব উপায়ে নির্যাতন করে। তাকে একমাত্র হত্যা করা ছাড়া শারীরিকভাবে অকল্পনীয় নির্যাতনে দগ্ধ করে। কোনোভাবেই তাকে ইসলামচ্যুত করতে না পেরে তারা তাকে প্রস্তাব করে, যদি সে তার সব সম্পদ, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দেশত্যাগী হতে পারে তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হন। যাওয়ার আগে কাফিরদের জানিয়ে যান, এসব ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন তাঁর বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পায়ের একটি ধূলিকণারও সমান নয়।'

হারিস (রা.)-এর শাহাদাত বরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেয়ার আদেশ পাওয়ার পর প্রায়ই কা'বার সমাবেশে তাওহীদের মাহাত্ম্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা এবং শিরকের অসারতা তুলে ধরে বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করতেন। এ রকম এক বক্তৃতার দিনে উপস্থিত কাফিররা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময়ে খাদীজা (রা.)-এর পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারিস বিন আবু হালা সেখানে উপস্থিত হন এবং আক্রমণোদ্যত লোকদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বাদ দিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রমাগত আঘাতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন তিনি।

.ফাতিমা ও সাঈদ (রা.)-এর ওপর নির্যাতন:

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর বোন ছিলেন ফাতিমা। তাঁর স্বামী সাঈদ এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ কবুল করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে জন্য তাদের নানা রকম নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বিশেষত উমর (রা.) নিজে তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করেন। তাঁর প্রহারে তাঁরা রক্তাক্ত এবং আহত হন। তারপরও ভাইকে বলে দেন- 'তোমার যা ইচ্ছা তা করতে পার। কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমরা এর ওপরই সুদৃঢ় আছি।' বোন-ভগ্নিপতির দৃঢ়তা উমরকে বিস্মিত করল। তিনি তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তাঁর মধ্যে বিপুল ভাবাবেগ তৈরি হলো। তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ কবুলের সিদ্ধান্ত নেন।

সমাজচ্যুতি: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য মক্কার কুরাইশ-কাফিররা যে নির্মম নির্যাতন পরিচালনা করে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো নব্যুয়তের ৬ষ্ঠ বছর থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক বয়কট।

আরবের সব গোত্র ও সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলিমদেরকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সব রকম লেনদেন, কেনাবেচা, খাদ্য-পানীয় সরবরাহ, যে কোনো ধরনের সামাজিক সম্পর্ক না রাখার ক্ষেত্রে তারা ঐকমত্য পোষণ করে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথীদের নিয়ে শিআবি আবি তালিব বা আবু তালিবের উপত্যকায় চলে যান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাহায্য করার কারণে বনু হাশিমও এ বয়কটের শিকার হয়। ফলে ইসলাম গ্রহণ করেনি এমন অনেকেই এ অমানবিক অবস্থায় গড়ে। তাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার লেনদেন, বেচাকেনা ও বিনিময় বন্ধ করে দেয়ায় খাদ্য-পানীয়ের তীব্র অভাব দেখা দেয়। বয়স্ক লোক এবং শিশুদের অবস্থা হয় সবচেয়ে করুণ। ক্রমাগত অনাহারে মায়েদের অবস্থা এতই অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে যে তাদের স্তনবৃন্তে দুধের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের আর্তচিৎকারে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। গাছের পাতা, শুকনো চামড়া ইত্যাদি অখাদ্য খেয়ে তাদের মানবেতর জীবন কাটাতে থাকে। দীর্ঘ তিন বছর এ অবরোধ বা সামাজিক বয়কট অব্যাহত থাকে। খাদ্য-পানীয়ের তীব্র কষ্টে সব মুসলিমের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলেও তাঁরা একটি বারের জন্যও ধৈর্য হারাননি। বরং পরম নির্ভরতায় নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছেন।

১০. আবু জর (রা.)-এর ওপর নির্যাতন: গিফার গোত্রের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি

ছিলেন আবূ জর। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ গ্রহণ করে কা'বা প্রাঙ্গণে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে তাওহীদের দাওয়াহ পেশ করেন। উপস্থিত কুরাইশ কাফিররা তাঁর দাওয়াতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আক্রমণকারী কুরাইশদের বললেন, ইনি গিফার গোত্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। তোমাদের বাণিজ্যপথ গিফার গোত্রের আবাসস্থলের সঙ্গে। তোমরা যদি তাঁকে নির্যাতন কর তাহলে তোমাদের বাণিজ্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে।' তার কথায় লোকেরা নিবৃত্ত হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর নির্যাতন:

আল্লাহর দীনের দাওয়াহ দিতে গিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)ও নিরাপদ ছিলেন না। তাঁকেও অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বংশগত মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, সততা প্রভৃতি কারণে কুরাইশরা প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সরাসরি নির্যাতন করার সাহস পায়নি। সে সময়ে তারা তাঁকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করেছে। উপহাস,বিদ্রূপ, অশালীন গালি-গালাজ প্রভৃতির মাধ্যমে মানসিকভাবে তাঁকে দুর্বল করাং চেষ্টা করেছে তারা। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে অপ্রস্তুত করার এবং কষ্ট দেয়ার নব আয়োজন তারা করেছিল। তিনি একবার কা'বা প্রাঙ্গণে সালাত আদায় করছিলেন এ সময়ে উকবা ইবনে আবি মুঈত উটের গলিত নাড়ী-ভুঁড়ি এনে তাঁর ওপর নিক্ষেপ করে। উটের বিপুল নাড়ী-ভুঁড়ির চাপে তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। ফরিং (রা.) তাঁকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। আরেকবার সালাতের মধ্যে কাফিররা চাদা দিয়ে তাঁর গলা পেঁচিয়ে তাঁকে টানতে থাকে। এতে তাঁর শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়। তবে তাঁর প্রতি প্রধানত তারা এমন সব অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করত যে, রাসুলুল্লার (সা.)-এর পক্ষে তা নির্বিকার চিত্তে সহ্য করা সম্ভব হলেও তাঁর সবিবেচক শত্রুরা পর্যন্ত শ্র সহ্য করতে পারত না। হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কাফিরদের এমনি ধরনের অশ্রাব্য গালি-গালাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে।

সাধারণভাবে মক্কায় শারীরিকভাবে নির্যাতিত না হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মানসিক পীড়নের কোনো অন্ত ছিল না। তাছাড়া শিআবি আবি তালিবের বয়কট তিনিও ভয়ঙ্কর কষ্টকর দিন কাটিয়েছেন। মক্কায় দাওয়াতের শেষপর্যায়ে শারীরিক ভাবেও তিনি নির্যাতিত হন। ৬২০

খ্রিস্টাব্দে মক্কার সত্তর মাইল উত্তর-পূর্বে তায়িফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের দাওয়াহ দিতে গিয়ে নির্মম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তায়িফে দাওয়াহ শুরু করার পর সেখানকার আবদ ইয়া লায়িল, মাসউদ ও হাবীব নামের তিন সহোদর তাঁকে উপহাস করা শুরু করে। তাদের ইঙ্গিতে ও উৎসাহে তায়িফের দুষ্ট লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সহচর যায়দ (রা.)-এর পেছনে পেছনে চলতে থাকে। তারা তাঁদেরকে নানা রকম অশালীন কথা বলে গালি দিতে থাকে। নানা রকম উপহাস, তির্যক মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও যায়দ (রা.)-কে লক্ষ করে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাদের নিক্ষিপ্ত পাথরে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) রক্তাক্ত হন। রক্তে তাঁর দেহ মুবারকের সঙ্গে জামা লেগে গেল। পা থেকে জুতা খোলা অসম্ভব হয়ে উঠল। যায়দ (রা.)ও আহত হলেন। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) অবিচলিত চিত্তে দশদিন ধরে তায়িফে দাওয়াহ অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তায়িফবাসীদের জন্য গজবের ঘোষণা নিয়ে জিব্রাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন। কিন্তু প্রিয়নবী এত নির্যাতনের পরও তায়িফবাসীর ধ্বংস চাইলেন না। বরং আল্লাহর কাছে হাত তুলে বললেন- 'ওদেরকে ক্ষমা কর প্রভু। ওরা তো আমাকে চেনে না। ওদেরকে ধ্বংস করে ফেললে আমি কাদের কাছে দাওয়াহ পেশ করব?'

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় ফিরে এলেন কিন্তু তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই আর মক্কায় স্বাভাবিকভাবে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। মক্কার কাফিররা চূড়ান্তভাবে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। এ অবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হামযা ছিলেন তাঁর সমবয়স্ক এবং বীরপুরুষ। মক্কায় তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকাশ্য দাওয়াহ শুরু করার পর আরবের লোকেরা তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করে। নানা রকম অশ্রাব্য ভাষায় তাঁকে গালি-গালাজ করতে থাকে। বিদ্রূপ-উপহাসে তাঁর জীবন বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে। হামযা (রা.) একবার শিকার থেকে ফিরে এসে দেখেন কা'বা চত্বরে আবু জাহলসহ বেশ কয়েকজন কাফির রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালি-গালাজ করছে। তাদের নোংরা এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ এতটাই জঘন্য ছিল যে, হামযা (রা.) উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং উপস্থিত বিদ্রূপকারীদের

চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন। হামযা (রা.)-এর মতো সাহসী বীরপুরুষের ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতকে সহজ করে তোলে।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ কাফিরদের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত অন্যায় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করায় এবং তাদের শোষণ, অত্যাচার নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা রাখায় তারা তাঁর ওপর ভয়ঙ্করভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর সুন্দর আচরণ, মুমিনদের সুন্দর জীবনযাত্রা, ইসলামের যুক্তিসিদ্ধ জীবনবিধান- কোনো কিছুই তাদেরকে স্বস্তি দেয় না। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নির্মূল করার জন্য তাঁর নওমুসলিম সাথীদের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন পরিচালনা করে। তাদের নির্যাতন-নিপীড়ন এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুমিনদের পক্ষে মক্কায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এ সময়ে আপাত শান্তির জন্য ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে ১৬ জন পরে আরো ৮৩ জন নওমুসলিম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। বিপুল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় থেকে যান এবং দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন।

প্রলোভন:

দাওয়াহ থেকে বিরত রাখার নতুন পদক্ষেপগালি-গালাজ, উপহাস, বিদ্রূপ এবং চূড়ান্তভাবে শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে নওমুসলিমদের একটি বড় অংশকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দাওয়াহ অব্যাহত রাখেন। এতে কাফিররা নির্যাতনের পথ রেখে নতুন পথে অগ্রসর হয়। তারা বিভিন্ন প্রলোভনে প্রলোভিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দাওয়াতের এ পথ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। উতবা বিন রবীআ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে, তিনি যদি দাওয়াহ থেকে বিরত থাকেন তাহলে তারা তাঁকে আরবের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ দিয়ে তাঁকে আরবের সবচেয়ে ধনী-মানুষে পরিণত করবে। কিংবা তিনি যদি চান আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের প্রলোভনে ভুললেন না। তিনি বললেন, আমার এক হাতে চাঁদ আর আরেক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি দা থেকে বিরত থাকব না।' ফলে কাফিরদের এ চেষ্টাও মাঠে মারা গেল।

লবীদের ইসলাম গ্রহণ

লবীদ বিন রবীআ আরবের একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। আরবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে তিনি সাড়া দেন সূরা কাওসার পাঠ করার পর। তিনি বুঝতে পারেন, এ জাতীয় কোনো কিছু রচনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণ কুরআনের অলৌকিকত্বকে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ আরো বেশি বেগবান হয়।

উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

অজ্ঞতার যুগে মক্কায় যে সতেরো জন শিক্ষিত আরব ব্যক্তিত্ব ছিল তার মধ্যে উমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। তরুণযোদ্ধা, ভাষাবিদ এবং নেতা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরব নেতাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। কিন্তু কেউই সাহস করে এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করতে পারেননি। বনু হাশিমের ক্রোধকে তারা বিশেষভাবে বিবেচনায় এনেছিল। উমর বিন খাত্তাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিলেন। তিনি খোলা তলোয়ার নিয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তাঁকে বলা হলো, 'আগে নিজের ঘর ঠিক কর। তোমার বোন আর বোনজামাই যে ইসলাম গ্রহণ করে বসে আছে!' উমর গতি পরিবর্তন করে বোনের বাড়ি উপস্থিত হলেন। সেখানে তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় অমানুষিক নির্যাতন করলেন। কিন্তু তারা কোনোভাবেই ইসলাম পরিত্যাগ করলেন না। তাঁদের দৃঢ়তা দেখে উমর কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতের উৎসুক্য দেখালেন এবং কুরআন তিলাওয়াতের পর তার মধ্যে ভাবান্তর তৈরি হলো। তিনি খোলা তলোয়ার হাতেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছুটে গেলেন; তবে তাঁকে হত্যা করার জন্য নয় বরং নিজেকে সমর্পণের জন্য। উমরের ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের কাজে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করল। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিমগণ প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে কা'বায় গিয়ে সালাত আদায় করে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'আল ফারুক' উপাধিতে বরণ করে নিলেন।

জিন জাতির ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ ছিল সর্বজনীন। তিনি ছিলেন বিশ্বজাহানের সব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। জিন জাতিও এর বাইরে ছিল না। তায়িফে ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে গিয়ে চরম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার রহমতে জিন জাতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়িফের যন্ত্রণা ভুলে যান। তাঁর দাওয়াতে নতুন মাত্রা ও গতি সঞ্চারিত হয়।

মি'রাজ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদদদাতা হিসেবে তাঁর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করেও আরব কাফিরদের তিন বছর মেয়াদি বয়কটের শিকার হন। বার্ধক্যজনিত কারণে খাদ্য-পানীয়ের অভাব সহ্য করার মতো শারীরিক অবস্থা তার ছিল না।

আবি তালিবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার শরীর ভেঙে পড়ে এবং বয়কট ভেঙে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলিমদের দাওয়াতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আবূ তালিবের মৃত্যু কাফিরদের অত্যাচারের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা আল কুবরা (রা.)। তাঁর ইন্তিকাল রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিহ্বল করে দেয়। আবূ তালিব তাঁর দাওয়াতের সমর্থক ছি আলহামদুলিল্লাহলেন, আর খাদীজা (রা.) জীবন দিয়ে তাঁর দাওয়াতকে ধারণ করেছিলেন। তাদের যুগল মৃত্যু তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। আবূ তালিবের মৃত্যু তাঁকে বাহ্যিক দিক দিয়ে, আর খাদীজা (রা.)-এর মৃত্যু মানসিক দিক দিয়ে নিঃস্ব করে দেয়। এই ব্যথা-বেদনা নিয়েই তিনি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং তায়িফে অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। সব দিক থেকে এমন বিরূপ অবস্থার শিকার রাসূলুল্লাহ (সা.) শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে যখন অনেকটা দুঃখভারাক্রান্তও ঔহতাশাগ্রস্ত; আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে মি'রাজে ডেকে নেন। পৃথিবীর সব নবী-রাসূলের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে জীবিতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেন। তাঁকে বিশ্বজাহান সফর করানো হয়। জান্নাত-জাহান্নাম, সপ্তস্তবক আকাশ, বিভিন্ন নবী-রাসূল এবং আল্লাহর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করানো হয়। নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বছরে ৬২১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রজব রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অপার্থিব অভিজ্ঞতা লাভকরেন। একে মি'রাজ বলা হয়। এ সময়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা ও পারস্পরিক আচরণের বিভিন্ন নির্দেশনা লাভ করেন। বিশেষভাবে লাভ করেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান। মি'রাজের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়।

বায়আতুল আকাবা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের ইতিহাসে বায়আতুল আকাবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হজ উপলক্ষে মক্কায় বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক সমাগম হতো। ইয়াসরিবও (মদীনা) এর বাইরে ছিল না। প্রতিটি হজ মওসুমে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজে আগত লোকদের কাছে বিভিন্নভাবে তাঁর দাওয়াহ পেশ করতেন। নব্যুয়তের দশম বছরে ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাজরাজ বংশের কতিপয় লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্বভাব ও পরিকল্পনা অনুসারে দাওয়াহ পেশ করেন। তাদেরকে কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। আল্লাহর কালাম শুনে তাঁরা অত্যন্ত প্রভাবিত ইন এবং বুঝতে পারেন যে, ইহুদি আলিম ও খ্রিস্টান পাদ্রিদের কাছে তারা যে নবী আসার সম্ভাবনার কথা শুনেছেন মুহাম্মদ (সা.) হলেন সেই নবী। কাজেই তাঁরা বিনা বাক্য ব্যয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ছোট্ট দলে মোট ছয়জন লোক ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে ইয়াসরিবে ইসলামের দাওয়াহ ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী বছর ইয়াসরিবের বারোজন লোক আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা তাঁর কাছে ছয়টি মৌলিক বিষয়ে শপথ গ্রহণ করলেন। এগুলো হলো-

ক. এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না;

খ. চুরি করব না, চুরিকে প্রশ্রয় দেব না;

গ. ব্যভিচারে লিপ্ত হব না;

ঘ. নিজ সন্তানদের হত্যা করব না;

ঙ. কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেব না ও কারো গীবত করব না এবং

চ. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ কখনোই অমান্য করব না।

এ শপথ গ্রহণ শেষে তাঁরা ইয়াসরিব ফিরে যান। তাঁদের অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসআব বিন আমীর (রা.)-কে তাঁদের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। মাসআব (রা.) ইয়াসরিবে

মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে কেবল কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে লাগলেন। তাঁরা আরবি ভাষাভাষি হওয়ায় কুরআনের এ দাওয়াতই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কুরআন শুনে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। বিশেষত আওস গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মাআজ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ইয়াসরিবে ইসলামের দাওয়াতের অন্যতম সফলতার স্মারক হয়ে উঠল।

পরের বছর মক্কায় হজে গেলেন বাহাত্তর জন লোক। তারা আকাবা গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর দাওয়াহ কবুল করলেন। তাঁরা জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের যে কোনো কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তিনি দলের মধ্য থেকে বারোজনকে নেতা নির্বাচিত করলেন। নেতাদের নয়জন খাজরাজ গোত্রের, আর তিনজন আওস গোত্রের। এরাও আগের লোকদের মতো ছয়টি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তাঁদের শপথের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন-'যদি তোমরা এ শর্তগুলো পালন কর তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। আর যদি না কর তাহলে তোমাদের পুরো বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের ক্ষমা করতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন।'

কথাবার্তার এ পর্যায়ে সা'দ বিন জাররাহ দাঁড়িয়ে বলেন, 'ভাইসব! তোমরা কি বুঝতে পারছ, কী কথার ওপর তোমরা শপথ গ্রহণ করেছ? জেনে রাখ, এ শপথ গোটা আরব ও অনারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।' সবাই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, আমরা সবকিছু বুঝে-শুনেই এ শপথ গ্রহণ করছি।'

প্রতিনিধি দলের আরো কয়েকজন সদস্য এ ধরনের জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, যদি কখনো মক্কা থেকে কোথাও যেতে হয় তিনি যেন ইয়াসরিবেই যান। ইয়াসরিববাসী তাঁকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবে।'
পুরো প্রক্রিয়াটি আকাবা নামক স্থানে সংঘটিত হওয়ায় মদীনাবাসীদের এ শপথ তায়আকুল আকাবা বা আকাবার শপথ' নামে খ্যাত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এওয়াতের ইতিহাসে বায়আতুল আকাবা এক নতুন সম্ভাবনার মহাদিগন্ত উন্মোচিত করে।

মদীনায় দাওয়াত

লিলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর তাঁর দাওয়াহ একটি নবতর যুগে ধবেশ করে। এতদিনের বিরুদ্ধ পরিবেশের পরিবর্তে তা অপূর্ব অনুকূল পরিবেশ লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাথীরা এ অনুকূল অবস্থা কাজে লাগানোর জন্য নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেন। ফলে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে তাঁদের দাওয়াহ পরিপূর্ণতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানে পর্যায়ক্রমে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

দাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র

রাসূলুল্লাহ (সা.) যেদিন মদীনা আগমন করেন সেদিন শুক্রবার ছিল। তিনি যেখানে প্রথম অবস্থান করেন সেটি ছিল কুবার বুন সালিম গোত্রের আবাসস্থল। এখানে জোহরের সালাতের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমবারের মতো জুমুআর সালাত আদায় করেন। সালাতের আগে খুতবা দান করেন এবং খুতবায় ইসলামের দাওয়াতের বিস্তারিত নির্দেশনা উপস্থাপন করেন। এরপর তিনি কোথায় অবস্থান করবেন তা নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করলেন, তাঁর উট যার ঘরের সামনে থামবে, তিনি তাঁর ঘরেই থাকবেন। আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মেহমানদারী করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তাঁর দোতলা ঘরের দোতলা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য ছেড়ে দিলেন। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাছে লোকদের আগমন এবং দাওয়াতের কথা চিন্তা করে নিচতলায় থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেন। আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাসভবন মদীনায় ইসলামের প্রথম দাওয়াতী কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠল।

মদীনায় দাওয়াতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন দাওয়াতের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় লোক তৈরির জন্য। মদীনায় দাওয়াতী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা সংরক্ষণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হন। এখানে সংক্ষেপে যুদ্ধগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বদর যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনা হিজরতের দ্বিতীয় বছরেই নানা পারিপার্শ্বিক কারণে মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করে। কাফিরদের পক্ষে সে সময়ের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সহস্রাধিক সেনা যুদ্ধে অংশ নেয়। বিপক্ষে তিনশ' তেরো জন নিরস্ত্র মুমিন। কিন্তু দু'পক্ষের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। কাফিররা মুমিনদের ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু মুমিনদের লক্ষ্য

আত্মরক্ষা। কাফিরদের ধ্বংস করার ইচ্ছা তাদের নেই। এ যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয় ঘটে। তাদের নেতা শায়বা, উতবা, জামআহ, আস, উমাইয়া এবং আবু জাহলসহ সত্তরজন নিহত হয়, বন্দিও হয় সত্তর জন। বিপরীতে ১৪ জন মুমিন শাহাদাত বরণ করেন। এ জয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতী মিশনকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

উহুদ যুদ্ধ

বদরে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হিজরতের তৃতীয় বর্ষে কাফিররা মদীনা আক্রমণ করে। এবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেয় তিন সহস্রাধিক যোদ্ধা। শুরুতে মুমিনদের সংখ্যা সহস্রাধিক থাকলেও কাফিরদের ষড়যন্ত্রের দোসর মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত সাথী নিয়ে কেটে পড়ে। ফলে তারা সাতশত সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীতে পরিণত হন। যুদ্ধ শুরু হলে অবশ্য মুমিনদের বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। কাফিররা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ইতোমধ্যে মুমিনদের মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের একটি ঘটনা ঘটে। উত্তল পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ময়দানে ঢোকার একটি পথ ছিল। যুদ্ধ শুরুর আগে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাঘরের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র রহিনীকে এয় পাহারায় নিযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, যদি দেখ মাঠে নিয়াল-পরুন আমাদের লাশ খাচ্ছে তাও এ জায়গা ছাড়বে না।' কিন্তু প্রাথমিক এজয় দেখে পাহারাদার মুমিনরা এ সাবধানবাণী ভুলে যান। নেতার আদেশ লঙ্ঘন ভরে তারা গিরিপথ ছেড়ে গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাকুশলী খালিদ বিন ওয়ালিদ সুযোগটি কাজে লাগান। তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে গিরিপথ দখল করে পেছন থেকে হামলা করেন। একা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র তাদেরকে প্রতিহত করতে বার্থ হন। এবার দু'দিকের হামলায় মুমিনরা হতচকিত হয়ে পড়ে। তাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য নিশ্চিত জয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়। এ যুদ্ধে মুমিনরা চূড়ান্ত পরাজয়ের শিকার হয়েছেন ব্যাপারটি এমন নয়। তবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মূল্য শোধ করেছেন অনেক ক্ষতি মেনে নিয়ে। যুদ্ধে হামজা (রা.) সহ সত্তরজন সাহাবী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আহত হন। এরপরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের কোনো পর্যায়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গের এতটুকু দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি।

বীর মাওনার ঘটনা

উহুদ যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের ইতিহাসে আরেকটি করুণ অধ্যায় সংযোজিত হয়। জনৈক নাজদবাসী আবুল বারার অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) ৭০ জন মুসলিমের একটি দা'ঈ কাফিলা প্রেরণ করেন। বীর মাওনা নামক স্থানে উপনীত হয়ে কাফিলা বনু আমির গোত্রের অন্যতম নেতা আমির ইবনে তুফায়িলের কাছে দূতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একখানা পত্র পাঠান। পত্র হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগে অগ্নিশর্মা আমির দূতকে হত্যা করে এবং বীর মাওনা উপস্থিত হয়ে অবশিষ্ট ৬৯ জনের মধ্যে ৬৭ জনকে হত্যা করে। যুদ্ধ ছাড়া একসঙ্গে এতজন দা'ঈ সাহাবা (রা.)-এর শহীদ হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি দীর্ঘদিন ইশার সালাতের পরে বীরে মাওনার শহীদদের জন্য দু'আ করেন এবং তাদের হত্যাকারীদের জন্য ধ্বংস কামনা করেন। এ থেকেই বিতর সালাতের ধারা চালু হয়।

বুন কায়নুকার যুদ্ধ

উহুদে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাহ্যিক বিপর্যয়ের পর মদীনার ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা মদীনা সনদ ও তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আপোষ-মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বনু কায়নুকার বসতি পনেরো দিন ধরে অবরোধ করে রাখার পর তারা আত্মসমর্পণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে সাতশ ইহুদিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বনু কায়নুকার বহিষ্কার মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র বহুলাংশে কমিয়ে দেয়।

বনু নাজিরের নির্বাসন

ইহুদিদের অপর গোত্র বনু নযীর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা অব্যাহত রাখে। তারা একাধিকবার তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং সব ক্ষেত্রে মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করতে থাকে। তাদের ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বনু নযীর গোত্রের আবাসস্থল অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে খয়বরে নির্বাসন দেয়া হয়। বনু নযীরের নির্বাসন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র বন্ধ করে দেয়।

আহযাব যুদ্ধ

হিজরতের পঞ্চম বছর মক্কার কাফিররা আরবের সব গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ অভিযানে প্রায় দশ হাজার কাফির অংশগ্রহণ করে। সাহাবী সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিখা খনন করে শত্রু মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মদীনার সার্বিক অবস্থা এ কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল। এর তিন দিক বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক দেয়ালে নিরাপদ ছিল। উন্মুক্ত ছিল কেবল একটি দিক। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেদিকেই তিন হাজার সাহাবী নিয়ে রাত-দিন পরিশ্রম করে পরিখা খনন করেন। এ কারণে এ যুদ্ধের আরেক নাম পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ। কাফিররা মদীনা অবরোধে এসে পরিখার অভাবিত বাধার সম্মুখে পড়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। তারা দীর্ঘ একমাস মদীনা অবরোধ করে রাখে। ইতোমধ্যে মরুঝড়ে তাদের তাঁবু উড়ে যায়। অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবও নষ্ট হয়। তারা ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে কোনো ফলাফল ছাড়াই অবরোধ তুলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। বাহ্যত এ যুদ্ধের কোনো ফলাফল না হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতী মিশনে এর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। এরপরে গোটা আরবে তিনি অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন এবং মুমিনদের ক্ষতি সাধনে সদা সচেষ্ট বনু কুরায়যাকে ধ্বংস করা হয়। তাদের সব যুদ্ধোপযোগী লোকদের হত্যা করা হয়, বাকিদের বন্দি করা হয়। এভাবে দাওয়াতের ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইসলামের দাওয়াহ সম্বলিত চিঠি প্রেরণ:

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ্বের সব মানুষের প্রতি আয়াত প্রেরিত রাসূল। কুরআনে তাঁকে 'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত' আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর দাবি হলো, তিনি তাঁর দাওয়াহ কেবল আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন ন বরং পৃথিবীর সব প্রান্তে ছড়িয়ে দেবেন। হুদায়বিয়া সন্ধি-পূর্ব সময়ে ঘরের শত্রুনে মুকাবেলা করা, তাদের বিভিন্ন আক্রমণ প্রতিহত করা এবং যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হয়েছে বলে ইসলামী দাওয়াতো আন্তর্জাতিকীকরণ সম্ভব হয়নি। হুদায়বিয়া সন্ধি অভ্যন্তরীণ পরিবেশে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দাওয়াহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেন। তিনি তাঁর সাহাবা (রা.)-দের বলেন- 'আল্লাহ আমাকে সারা বিশ্ব্যে জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। আমার বাণী সারা দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য এবং এটা সবার জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ। দেখ, তোমরা ঈসার সাথীদের মতো মতানৈক্য কর না। যাও, আমার

পক্ষ থেকে সবার কাছে সত্যের আহ্বান পৌছে দাও।' রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আহ্বানের পর তাঁর সাহাবা (রা.)-গণ ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও সমকালীন বিশ্বের খ্যাতিমান বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের কাছে ইসলামের দাওয়াহ দিয়ে গি পাঠান। সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন যে, তিনি ঠিক ক'জন রাজা-বাদশাহের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে যাদের কথা জানা যায় তারা হলেন-

১। রোম সম্রাট কাইসার হিরাক্লিয়াস;

২। পারস্য সম্রাট কিসরা খসরু পারভেজ;

৩। মিসরের শাসক আজীজ;

৪। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী;

৫। সিরিয়ার গাচ্ছান গোত্রীয় শাসক শুরাহবিল;

৬। কনস্টান্টিনোপলের বাদশাহ;

৭। ওমানের শাসক;

৮। ইয়েমেনের শাসক বাজান;

৯। বাহরাইনের রাজা;

১০। ইয়ামামার শাসক;

১১। দামেস্কের আমীর এবং

১২। আম্মানের রাজা।

হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.) লিখেন-

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ-থেকে রোমের প্রধান শাসক হিরাক্লিয়াসের নামে। যে ব্যক্তি হিদায়াত বা সত্যপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল কর, তুমি শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। কিন্তু তুমি যদি আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিমুখ হও তাহলে তোমার দেশবাসীর অপরাধের জন্যও তুমি দায়ী হবে। (কারণ তোমার অস্বীকৃতির কারণেই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছতে পারবে না।)

হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করব না এবং আমাদের মধ্যেও কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের প্রভু বানাবো না। কিন্তু তোমরা যদি এ কথা মানতে অস্বীকৃত হও, তাহলে আমরা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।'

রোম সম্রাটের প্রতিক্রিয়া: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্র পাওয়ার পর রোম সম্রাট তাঁর ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করেন। বাণিজ্য উপলক্ষে রোমান সম্রাজ্যে আসা আবু সুফিয়ানকে পর্যন্ত তিনি তার দরবারে ডেকে নিয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তার সঙ্গে আলাপচারিতা শেষে সম্রাট নিজে থেকে যে বিবৃতি দেন তা তার বুদ্ধি ও বিবেচনাবোদের উচ্চমানই প্রমাণ করে। তিনি বলেন- 'নবী-রাসূলগণ সব সময় ভালো বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যদি এ লোকটির বংশে অন্য কেউ নব্যুয়তী দাবি করত তবে তার দাবিকে বংশগত প্রভাব বিবেচনা করা যেত। বলা যেত যে, রাজত্বের লালসায় তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। তাছাড়া প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকদের ব্যাপারে সে কখনো কোনো মিথ্যা কথা বলেনি, তাহলে আল্লাহর ব্যাপারে তিনি এমন মিথ্যা কথা বলবেন তা হতে পারে না। তাছাড়া নবী-রাসূলদের প্রথমদিকের অনুসারীরা স্বভাবতই গরিব শ্রেণির মানুষ হয়ে থাকে। আর সত্য ধর্মের অনুসারী সব সময় বাড়তে থাকে।

তাছাড়া তিনি কখনো কাউকে ধোঁকা দেননি, কারো সঙ্গে প্রতারণা করেননি। তিনি পাক-পবিত্রতা, সালাত, তাওয়াক্কুল ইত্যাদির নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এসবই যদি সত্য হয় তাহলে তাঁর আধিপত্য একদিন নিশ্চিতভাবেই আমার রাজত্ব পর্যন্ত পৌছবে। আমি জানতাম যে, একজন নবী আসবেন। কিন্তু তিনি যে আরবেই জন্ম নেবেন- এ ধারণা আমার ছিল না। আমি যদি সেখানে যেতে পারতাম তো নিজেই তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।'

সম্রাটের এ অভিমত শুনে তার দরবারের পাদ্রি ও সভাষদরা অত্যন্ত রুষ্ট হলো। তারা গাধার মতো উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকল।

তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্থিরতা ও উত্তেজনা তৈরি হলো। তাদের এ অবস্থা সম্রাটের ক্ষমতা ও অর্থ-বিত্তের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে তিনি তার সুবিবেচনা ত্যাগ করলেন। বিবেকের ওপর জয়ী হতে দিলেন ক্ষমতা ও অর্থের লোভ। তিনি চিৎকার করে বললেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমি এসব কথা বলেছি। আসলে আরবে নবী দাবিকারী লোকটির ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

তার কথায় সভাষদ ও পাদ্রিরা শান্ত হলো। তারা সম্রাটকে কুর্ণিশ করে প্রশান্ত মুখে দরবারে আসীন হলো।

পারস্য সম্রাটের কাছে চিঠি: পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে রাসূলুল্লাহ (সা.)

লেখেন-

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের প্রধান শাসক কিসরা সমীপে।'

যে ব্যক্তি হিদায়াত অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নবী, যেন প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে আল্লাহর নাফরমানীর মন্দ পরিণতি ব্যাপারে সতর্ক করতে পারি।

তুমিও আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল কর। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে। তা না হলে অগ্নিপূজকদের পাপের জন্য তুমি দায়ী হবে।'

সম্রাটের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি:

খসরু পারভেজ ছিল আত্মগর্বী অহঙ্কারী সম্রাট। তার কাছে প্রথমে আল্লাহর নাম, তারপর পত্র প্রেরকের নাম এবং শেষে অত্যন্ত সাধারণভাবে তার নাম লেখা পত্রের ধরনটাই ছিল অসহ্য। প্রচলিত রীতিতে সবার আগে তার নাম উল্লেখ করার রীতি ছিল এবং তার নামের সঙ্গে অসংখ্য সম্মানসূচক পদবী জুড়ে দেয়ার বিধান ছিল। তাছাড়া পারস্য সম্রাট স্থির চিন্তার লোকও ছিলেন না। চিঠি দেখে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিঠির প্রতি কোনো রকমের সম্মান না দেখিয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আমার গোলাম হয়ে আমায় এমনভাবে চিঠি লেখার স্পর্ধা!' এরপর তিনি পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং নব্যুয়তের এই দাবিদারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তার সামনে হাজির করার জন্য ইয়েমেনস্থ গভর্নরকে নির্দেশ পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আচরণের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং বললেন, 'খসরু আমার চিঠি যেভাবে ছিঁড়ে ফেলেছে তার রাজত্ব অচিরেই সেভাবে ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।' পরবর্তীতে হয়েছিলও তাই।
ইয়েমেনের গভর্নর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তার দরবারে ডেকে নেয়ার জন্য দু'জন কর্মচারী পাঠালো। এরই মধ্যে খসরু পারভেজের পুত্র তাকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসন দখল করে বসল। গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত কর্মচারীরা এ সম্পর্কে কিছুই অবহিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি কর্মচারী দু'জনকে ঘটনা জানিয়ে বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং গভর্নরকে গিয়ে বল, ইসলামের কর্তৃত্ব সহসাই পারভেজের রাজধানী পর্যন্ত পৌছে যাবে।'
গভর্নর এর কর্মচারীদ্বয় ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে জানতে পারল, খসরু পারভেজ সত্যিই নিহত হয়েছে।

আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী ও মিসরের আজীজের নামে পত্র: আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছেও রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় একই রকম পত্র প্রেরণ করেন। জবাবে নাজ্জাশী লিখলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য নবী।' নাজ্জাশী ইতিপূর্বে হযরত জাফর (রা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মিসরের শাসক আজীজ যদিও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন না, তবে দূতকে তিনি খুব সম্মান ও সমাদর করলেন এবং অনেক উপঢৌকন দিয়ে মদীনায় ফেরত পাঠালেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ নিয়ে অন্যান্য রাজা-বাদশাহর কাছে যেসব দূত প্রেরিত হয়েছিলেন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্মান পেয়েছেন। সব ক্ষেত্রেই শাসকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরও কেবল ক্ষমতা হারানোর ভয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার সাহস করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূতের সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ আচরণ করেছে সিরিয়ার গাসসান গোত্রীয় শাসক শূরাহবিল। সে দূতনীতির সব আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ভঙ্গ করে মুসলিম দূতকে হত্যা করে।

খসরু পারভেজ ও শূরাহবিলের দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া বহির্বিশ্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ সাধারণভাবে অভিনন্দিত হয়। নাজ্জাশী ছাড়া এ দাওয়াতে কোনো শাসক সাড়া দিতে না পারলেও তারা এর বিরোধিতা করেননি। তাদের কেউই একে মিথ্যা
বা বোগাস বলে উড়িয়ে দেননি।

দাওয়াতের স্থিতিশীলতা

হুদায়বিয়া সন্ধি-পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ একটি স্থিতিশীল অবস্থায় উপনীত হয়। অভ্যন্তরীণ হামলা ও বহিঃআক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ায় তিনি তাঁর দাওয়াহ অত্যন্ত সংহত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় প্রসারিত করার সুযোগ পান। তাঁর এবং সাহাবা (রা.)-দের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগে আরবের সাধারণ লোকজন এমনিতেই ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।অনেকে ইসলাম গ্রহণও করে। দাওয়াতের এ স্থিতিশীল অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের জন্য ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালনকারী কতিপয় পক্ষকে পরাভূত করেন এবং কয়েকটি আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করে দাওয়াতকে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য:

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক অকল্পনীয় অন্ধকার যুগে, সীমাহীন প্রতিকূলতায় আরব আযীমে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন ব্যক্তি জীবনে শৃঙ্খলা ছিল না। পরিবার জীবনে সুখ ছিল না। সমাজ জীবনে ছড়িয়ে ছিল অশান্তির বিভীষিকা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনকালীন সময়ে বিশ্ব রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি রাহুগ্রস্ত ছিল। মানুষের চির আরাধ্য শান্তি ও স্বস্তি

কেড়ে নিয়েছিল সামষ্টিক অরাজকতা। রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দাওয়াতী মিশনের মাধ্যমে এ অবস্থা বদলে ফেলেন। একটি দীর্ঘ ও কষ্টকর প্রচেষ্টায়, অবিরাম সাধনায়, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষায়, অকল্পনীয় কর্ম-কুশলতায় আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মিশন সফল করে তোলেন। ঊষর মরুর বুকে বইয়ে দেন সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের ঝর্ণাধারা। সর্বোতভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয় তাঁর দাওয়াত। এখানে তাঁর দাওয়াতের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. মানব প্রকৃতি সহজাত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মানুষের প্রকৃতি সহজাতবিষয়। কেননা, এ দাওয়াহ আল্লাহর দীনের দাওয়াত। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্রষ্টা। তিনি তাঁর দীনে এমন বিষয়ই শুধু রেখেছেন যা মানুষের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়- যা মানুষ সহজে মেনে নিতে ঔপারে।

২. বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিশ্ববাসীর জন্যরহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি বিশ্বনবী। যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহবিশ্বজনীন এবং সর্বকালীন। কোনো দেশ-কাল-ভাষা-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি এ দাওয়াহ গ্রহণ করতে পারে। তাঁর এ দাওয়াহ বিশেষ কোনো যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কোনো সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এ দাওয়াহ সব যুগের, সব কালের মানুষের জন্য।

৩. পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার প্রতিকৃতি। এতে মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় সমাধান দেয়া হয়নি।

৪. সমন্বিত জীবন ব্যবস্থা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ দাওয়াহ জীবনের বিশেষ কোনো অংশকে অহেতুক গুরুত্ব দেয় না, আবার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়কে উপেক্ষা করার আদেশও দেয় না। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও দিকের সঙ্গে অন্যান্য দিক ও ক্ষেত্রগুলোর যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধন করে। এতে যেমন দুনিয়াকে উপেক্ষা করতে বলা হয় না, তেমনি শুধু দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকার কথাও বলা হয় না। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কথাই বলা হয়।

৫. জীবন দর্শন, জীবনবিধান ও জীবন ব্যবস্থা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ নিছক দাওয়াহ নয়। বরং তা একই সঙ্গে জীবন দর্শন, জীবনবিধান এবং জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান এ দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে।

৬. ব্যাপকভিত্তিক আদর্শ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ কোনো সংকীর্ণ মতার্দশ নয়, বরং এর ব্যাপকতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের জীবন পথের দিশা আছে এ দাওয়াতে। এ কারণে মানুষের জীবনের কোনো ক্ষুদ্র দিকও এর আওতার বাইরে কল্পনা করা যায় না। সাধারণ বিবেচনায় তুচ্ছ একটি বিষয়ের সমাধানও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেয়া হয়েছে। এতে যেমন রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ পেশ করা হয়েছে- সে সঙ্গে একজন মানুষ কীভাবে পায়খানা প্রসাব করবে সে সম্পর্কেও হুকুম প্রদান করা হয়েছে। জীবনের সব দিক সম্পর্কে এমন নিখুঁত হুকুম-আহকাম পেশ করায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের সর্বব্যাপী বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অবিসংবাদিত হয়ে উঠেছে।

৭. ভারসাম্যপূর্ণ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা "প্রদান করেছে।

পৃথিবীর অপর কোনো মতাদর্শ জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন ভারসাম্য স্থাপন করতে পারেনি। কেউ হয়তো দুনিয়া নিয়ে আছে, আর কারো কারবার শুধু আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে। কেউ কেউ শুধু আর্থিক সমস্যাকে মানুষের মূল সমস্যা হিসেবে দেখেছে। কেউবা জৈবিক সমস্যাকে মানুষের মূল সমস্যা শনাক্ত করে তার সমাধানের জন্যই বিধান প্রণয়ন করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ জীবনের কোনো আংশিক সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে না দেখে গোটা জীবনের মধ্যে একটি অনিবার্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ পেশ করেছে। ফলে তাঁর দাওয়াহ প্রদর্শিত পথই সহজ-সরল, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

৮. মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ হলো মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। কেবল তাঁর দাওয়াতই মানুষকে যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। একটি বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে রাসূলের দাওয়াতে নিহিত আছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা মানুষের মুক্তি নিয়ে এমন বিন্যস্ত আদর্শ পেশ করতে পারেনি। পৃথিবীতে মানুষ যেসব মতবাদ উদ্ভাবন ও প্রচলন করেছে তার প্রতিটি ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থ সংরক্ষণেই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। সেগুলো জাতীয় বা আঞ্চলিক মুক্তি নিয়ে কাজ করেছে। ফলে সেগুলো বিশ্বজনীন

এবং সর্বকালীন মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ এসব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তির পথ ও উপায় নির্দেশ করে বিধান প্রণয়ন করেছে।

৯. আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ নিছক কোনো ধর্মীয় আন্দোলন নয়, কিংবা তা কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথাও বলে না, বরং তাঁর দাওয়াহ একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত সমাধান পেশ করে থাকে।

১০. মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতার একমাত্র নির্দেশনা হতে পারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত। কেননা, এতে আছে গবেষণার আদেশ, মানবকল্যাণের অনিবার্য নির্দেশনা। এর বাইরে গিয়ে মানুষ যে কাজই করবে তা কোনোভাবেই তার কল্যাণ বয়ে আনবে না। কেননা, কল্যাণের সব মূলনীতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের আওতাভুক্ত বিষয়।

১১. মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ তা'আলা শুধু মানুষ সৃষ্টি করেননি, বরং বিশ্বজাহানের প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ বিশ্বজাহানের প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করে সবার মধ্যে একটি অনিবার্য আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এ সম্পর্কের কারণেই সৃষ্টির সেবা করা মানুষের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১২. মানুষের মর্যাদা সংরক্ষক : আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরার মর্যাদা দিয়েছেন। পৃথিবীর সব সৃষ্টির ওপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সবকিছু মানুষের সুখ-সুবিধা ও ভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষ যদি পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির কাছে মাথানত করে তাহলে তার এ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না। আবার মানুষ যদি এমন কাজ করে যা তার মর্যাদা ও সম্মানের পরিপন্থী- তাহলেও তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মানুষের এ মর্যাদা রক্ষার অতন্দ্রপ্রহরী। যেসব কাজ ও নীতি মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তাঁর দাওয়াহ সেসব কাজের ব্যাপারে নিষিদ্ধতা আরোপ করে। আর যেসব কাজ মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে বা বৃদ্ধি করে সেগুলো করার আদেশ প্রদান করে।

১৩. নৈতিক দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মূলত পূর্ণাঙ্গভাবে একটিনৈতিক দাওয়াত। তাঁর আগমন প্রাক্কালীন সময়ে আরবের লোকের সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল তাদের চারিত্রিক অধঃপতন। কথা ও কাজে নীতিহীনতার জন্য তারা অমানুষে পরিণত হয়েছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, পাপাচার, ব্যভিচার, প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা, মদ, জুয়া প্রভৃতি পাপাচার তাদেরকে পুরোপুরি পাশবিক প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দাওয়াতে প্রথমেই তাদের এ নৈতিক স্খলন দূর করার নির্দেশনা দিলেন এবং তাদের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা মদপান, জুয়াখেলা, সুদের লেনদেন, মিথ্যাচার, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ব্যভিচার, সব প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা এবং অনাচার নিষিদ্ধ করে আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও নির্দেশনার আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের নৈতিক পরিশোধনের ব্যবস্থা করেন। সব সদাচার ও উন্নত নৈতিক আদর্শের ওপর মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেন। ফলে খুব শীঘ্রই আরব আযীমে এক বিপুল ব্যতিক্রম সাধিত হয়। যে মানুষের কাছে এতদিন জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা ছিল না- এখন সে মানুষগুলোই অপরের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জিম্মাদার হয়ে ওঠে। মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা, অশ্লীলতা, অশালীনতা, ব্যভিচার, পাপাচারসহ সব পাপ-প্রবণতা থেকে তারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তোলে।

১৪. ব্যক্তিগত দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো- এ দাওয়াহ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করেছে। তার মর্যাদা ও দায়িত্ব নির্দেশ করেছে। ব্যক্তির কার্যক্রমের জন্য নিতান্তই ব্যক্তিকে দায়ী ও দায়িত্বশীল ঘোষণা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।' রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেন- 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে দাওয়াহ দান করেন তা ব্যক্তিগত দাওয়াতে পরিণত হয়। প্রতিজন ব্যক্তি নিজস্বভাবে এর ফলে নিজেকে শুদ্ধ ও সংশোধন করার তাগিদ অনুভব করে।

১৫. পারিবারিক দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দাওয়াহ তাই শেষ পর্যন্ত পরিবারকেন্দ্রিক দাওয়াতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আলাদা আলাদাভাবে পরিবারের প্রতিজন সদস্যদের দায়িত্ব নির্দেশ করেন। কুরআন মাজীদে পারিবারিক জীবন-যাপনের আদেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাদের সামর্থ্য আছে তাদের বিয়ে করার আদেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'তোমরা বিয়ে কর।' পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করে বলা হয়েছে, 'তারা তোমাদের ভূষণ এবং

তোমরা তাদের ভূষণ।' পরিবার সংগঠনের পাশাপাশি পরিবারের সব সদস্য যেমন মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন ও অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে, তেমনি পারস্পরিক দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ পরিবার সংগঠনের ভিত্তি সংহত ও শান্তিপূর্ণ করার অনিন্দ্য সুন্দর ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

১৬. সামাজিক দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ দাওয়াহ গোটা সামাজিক কাঠামো বদলে দিয়েছিল। এ দাওয়াহ সমাজের সব শ্রেণির লোকদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত কর না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, ইয়াতিমের সঙ্গে মিসকিনের সঙ্গে, নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশীর সঙ্গে, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীর সঙ্গে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক লোকদের পছন্দ করেন না।'

১৭. রাষ্ট্রীয় দাওয়াত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর পথ থেকে সরিয়ে আদর্শিক ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করে। এ রাষ্ট্র শোষণ-নির্যাতনের পরিবর্তে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহর দেয়া আইন অনুসারে ইসলামী শাসনের অনুসারী জনগণ নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন আল্লাহ তা'আলা। কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ভিত্তিতে জনগণের পার্থির ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিতকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের।

১৮. অর্থনৈতিক দাওয়াত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন করে। তাঁর দাওয়াতের আগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ছিল না। হালাল-হারামের যাচাই-বাছাই ছিল না। অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ছিল না। সুদ-ঘুষ, জবর দখল, আত্মসাৎ, প্রতারণা প্রভৃতি অর্থনৈতিক অনাচার এ ক্ষেত্রে সীমাহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ ক্রমান্বয়ে এসব সাফ করে। এ ক্ষেত্রে অসম বণ্টন, শোষণ এবং অরাজকতা রোধে যাকাতের বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা দিয়ে বলেন- 'হে মানুষ জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে আহার কর। কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

'তোমরা সালাত কায়িম কর এবং যাকাত আদায় কর।' (আল-বাকারা: ৪৩)

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ কর না। তবে পরস্পরের সম্মতিতে সম্পদ বিনিময় করতে পার।' [সূরা নিসা: ২৯]

'যারা সোনা-রুপা জমা রাখে কিন্তু আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তির সুসংবাদ দিন।'

১৯. সাম্যবাদী: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এ দাওয়াহ মানুষের জীবনের সব পর্যায়ে সাম্যবাদী চেতনা জন্ম দিয়েছে। মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এ দাওয়াহ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের আগে আরব সমাজে মানুষে মানুষে বিরাট বৈষম্য ছিল। জন্ম, বংশ ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হতো। অভিজাতদের কোনো অন্যায়ই অন্যায় ছিল না। সমাজের সব সুবিধা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। জন্মগতভাবে যারা গরিব পরিবারে বা নীচ পেশার পরিবারে জন্মগ্রহণ করত তাদের ওপর যে কোনো ধরনের নির্যাতন করার, তাদেরকে ভোগ ও ব্যবহার করার অধিকার অভিজাতদের ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ এ অমানবিক ও অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। কেবল জন্মগত কারণে মানুষের শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি যে নির্ধারিত হতে পারে না, তিনি তার উদাত্ত ঘোষণা দেন। আল্লাহ বলেন- 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।'

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বলেন- 'কোনো আরবের ওপর অনারবের এবং কোনো অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, বরং তোমরা সবাই-ই আদমের সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।'

বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ হলো মানুষের সর্বজনীন কল্যাণ ও মঙ্গল নিশ্চিত করার দাওয়াত। যে কারণে কল্যাণকর যা কিছু মানুষ ভাবতে পারে তার সবকিছু আছে তাঁর দাওয়াতে। যে কোনো বিবেচনাতে তাই তাঁর দাওয়াহ অনবদ্য, অনন্য সাধারণ এবং অবিস্মরণীয় ও অনিবার্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণ ও মেনে চলার দাওয়াত। পার্থিব, অপার্থিব, জাগতিক, লৌকিক, পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জীবনের সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে মানুষকে তার পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলাই এ দাওয়াতের লক্ষ্য। তাঁর এ দাওয়াতে মানুষের জীবন এক সামগ্রিক অখণ্ড সত্তা। এর সব অংশের প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির এক স্বাভাবিক ঐক্য রয়েছে। এ ঐক্য থেকে জীবনের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মানব জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ ইহলোক, পরলোক, পার্থিব, অপার্থিব, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে এক অদৃশ্য সে হ স্থাপন করে মানুষের আপাতদৃষ্ট সীমিত জীবনকে এক মহাজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এক শাশ্বত চিরন্তন জীবনের সঙ্গে অমর বন্ধনে গ্রন্থিত করে। মানব জীবনের মল্যবোধের চৌহদ্দিকে অসীমলোকে উন্নীত করে।

নীতি বা বিশ্বাসই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন দর্শনের শেষ কথা নয়, বরং নীতি ও বিশ্বাস এর প্রাথমিক স্তর। কর্ম হলো এ স্তরের পরবর্তী ধাপ। তাঁর দাওয়াতের আসল লক্ষ্য হলো বিশ্বাস ও কর্মের মিলন ঘটিয়ে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধি। বিশ্বাস ও কর্মের এমন মণিকাঞ্চনযোগ পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম, আদর্শ, দর্শনে লক্ষ করা যায় না।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের প্রতিটি নীতি কর্মের মহিমায় প্রোজ্জ্বল, বাস্তবতার স্পর্শে মহীয়ান, দ্বীপ্তিমান। আল কুরআন ঘোষণা করে- 'মানুষ যা চেষ্টা করে তার বেশি পায় না।' আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'আমি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছি আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষার জন্য।' রাসূলুল্লাহ (সা.)ও ঘোষণা করেছেন-ইসলামে বৈরাগ্য সাধনা নেই।' তিনি আরো বলেছেন- 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।' কুরআন হাদীসের এসব ঘোষণা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ নীতি-সর্বস্ব ও কেবল বিশ্বাসভিত্তিক কোনো জীবন দর্শন নয়, বরং তা হলো নীতি ও বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নের এক স্বাভাবিক তাগিদ। এ দাওয়াহ গ্রহণ করার অর্থ তাই বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সে

বিশ্বাসের আলোকে কার্য সম্পাদন করা। মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন ধর্মের। এ বিকাশ জীবনের অন্তর্নিহিত স্তাবনা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে তাই মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রকাশ পায় মানুষের সামগ্রিক চেতনার পরিপূর্ণ পরিচয়। এ দাওয়াহ তাই শুধু একটি ধর্ম হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করে না, বরং একে উপস্থাপন করে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা এবং সৎ কাজ, সংচিন্তা ও সত্যবাদিতার ধর্ম হিসেবে। এটি আল্লাহ-প্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা ও আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলত ইসলাম তাত্ত্বিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। ইসলামের চেয়ে অন্য কোনো ধর্ম বা আদর্শে মানবতার বিকাশের এমন বৃহত্তর সম্ভাবনা নিহিত নেই। ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম, আদর্শ, মতবাদ বা দর্শনই অধিকতর বিশুদ্ধতা অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সঙ্গে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মানব প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সহজাত ও স্বভাবজাত প্রক্রিয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এটি যে কোনো যুগে উপযোগী, জীবনের গতিশীল যে কোনো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তা সব যুগের সব দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পালন করতে পারে। তা মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সব সমস্যার সার্থক সমাধান প্রদান করে।

সব যুগ ও সব জাতির ক্ষেত্রে তাঁর দাওয়াতী নীতিসমূহের রয়েছে বিস্ময়কর উপযোজন। প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞানের সঙ্গে এর রয়েছে সামগ্রিক সুসঙ্গতি। মানব হৃদয়ের বদ্ধমূল মৌল সত্যসমূহকে আবেগজাত অভিজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করার মতো কোনো অলৌকিক মতবাদ এ দাওয়াতে নেই। এখানে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ তার ব্যক্তিসত্তা বিকাশের চূড়ান্ত রূপের পরিচয়বাহী। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি, খ্রিস্টান ও সাবিঈন হয়েছে- তাদের মধ্য থেকে যে-ই আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (বাকারা: ৬২]।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বজনীন জীবন দর্শন হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ হলো মানব জীবনের কর্মময়, সরল, সহজ, বাস্তবধর্মী ও প্রত্যয়দৃপ্ত জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের ভেতরের সঙ্গে তার বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাসমূহও যে মানুষের অন্তর ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের চরিত্র ও

আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে- এ দাওয়াহ সে সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এ সচেতনতার জন্যই তা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে তার সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনেরও পর্যালোচনা করে। একে তাই বলা যায়, মানব জাতির পূর্ণতর জীবন ব্যবস্থা। ফলে ধর্মীয় জীবনে কোনো মুসলিম যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতী হুকুম-আহকাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় হুকুম আহকাম পালন করতে পারে না, তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও কোনো মুসলিম মার্কসবাদী বা লেলিনপন্থী হতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই তাকে মুসলিম থাকতে হয়। তার চিন্তা, কর্ম, আচরণ, বক্তব্য, লেনদেন বা অন্য কোনো কিছুতে কোনো রকমের অস্পষ্টতা থাকতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে মহিলা সাহাবাদের ভূমিকা

দুনিয়ার যে কোনো সংস্কার আন্দোলনের মতো ইসলামের বিকাশ-বৃদ্ধিতেও অসংখ্য মহিলা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মহিলা সাহাবা (রা.)-গণ যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন এখানে সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো: হযরত খাদীজা বিনতি খুওয়াইলিদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতে উজ্জল ভূমিকা পালনকারী নারী হিসেবে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করা অনিবার্য তিনি খাদীজা বিনতি খুওয়াইলিদ (রা.)। ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ সময়ে তিনি মক্কার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আর্থিক বিষয় নিয়ে ভাবতে দেননি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিশ্চিন্ত মনে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হতে পেরেছেন। আরবের সবচেয়ে ধনাঢ্য নারী এবং অভিজাত বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিজে খাবার বয়ে তাঁকে দিয়ে এসেছেন। তাঁর এ সহযোগিতাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ধ্যানস্থ হওয়া ও সত্যপথ সন্ধান সম্ভব করে তুলেছে। কেননা, তিনি যদি এ অবস্থায় কোনো ধরনের বাধা দিতেন তার পরিণতি কী হতো তা কেবল আল্লাহ তা'আলাই বলতে পারেন। শুধু যে ধ্যানে উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয় বরং তিনি তাঁর বিপুল সম্পদ ভাণ্ডারও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেছেন। তিনি নব্যুয়ত লাভের আগেই আরবের ইয়াতিম, মিসকিন, বিধবা ও অভাবী অসহায়দের মধ্যে সে সম্পদ অকৃপণ হস্তে ব্যয় করেছেন। এ সম্পদ যে কেবল অভাবীদের অভাব দূর করেছে তাই নয় বরং তা সর্বসাধারণের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দিয়েছে। নব্যুয়তের দাওয়াহ প্রচারে যা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ইসলামের ঠিক সূচনাপর্বে খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মানসিক সাহস ও

শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যেভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান তা তুলনাহীন। হেরা গুহায় নবুয়তের প্রথম প্রহরে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে আসেন আর তাঁকে বলতে থাকেন, 'আমাকে কম্বলাবৃত কর, আমাকে কম্বলাবৃত কর। আমি মৃত্যু বা মহাক্ষতির আশঙ্কা করছি'- তখন খাদীজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'আপনি ভয় পাবেন না। আপনি আতঙ্কিতও হবেন না। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি তো ইয়াতিমকে সম্পদ দেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেন, মানুষের উপকার করেন এবং বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ান। কাজেই পরম করুণাময় আপনাকে মৃত্যুর আশঙ্কায় ফেলবেন না।' এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সব কথা শুনলেন। খাদীজা সব কথা শুনে তাঁর বিরোধিতা করলেন না, বরং সবার আগে নিজে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। বললেন, আপনি যা শুনেছেন, যা দেখেছেন তা অবশ্যই সত্য।' তাঁর স্বীকৃতি ও সরল গ্রহণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল করে দিল। এরপর খাদীজা (রা.) তাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই এবং বাইবেলের পণ্ডিত ওরাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। সব শুনে ওরাকাও তাই বললেন, যা ইতোমধ্যে খাদীজা (রা.) বলে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বললেন যে, এক সময় মক্কার লোকেরা আপনার বিরোধিতা করবে। তারা আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেবে। আহা, যদি আমি সে সময় বেঁচে থাকতাম, তাহলে অবশ্যই আপনার সাথী হতাম।'

উপসংহার

ইসলামী দাওয়াহ বা নবীদের দাওয়াহ্ সাময়িক কোন আবেগ বা হঠাৎ উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং এটি একটি পরিকল্পিত,প্রজ্ঞাময় ও আবশ্যক কাজ। সব নবীদের দাওয়াতি কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা সব অবস্থায় গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

কখনো আবেগ অনুভূতি কাজে লাগিয়েছেন, কখনো দাওয়াতে ব্যবহার করেছেন ক্ষুরধার সহজবোধ্য অকাট্য যুক্তিসমূহ। আবার কখনো বা দাওয়াতের জন্য গড়ে তুলেছেন সুদৃঢ় বন্ধুত্ব। ক্ষেত্র বিশেষে বংশীয় বা ব্যক্তিত্বের সুসম্পর্ক।

মানুষের বাড়িতে হাটে বাজারে মেলায় হজে যে কোন জনসমাগমে সুযোগ ও প্রেক্ষাপট অনুকূল হলে ইসলামের দাওয়াহ দিয়েছেন ।

কারণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং কৌশল অবলম্বন করার আদেশ আল্লাহ তায়ালাই প্রদান করেছেন;

ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله هم التي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

অর্থাৎ তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর সবচেয়ে সুন্দর হবে নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন যে কে তার পথ ছেড়ে বিপদগামী হয় এবং যারা সঠিক পথে পরিচালিত তিনি তাদের সম্পর্কেও সবচেয়ে ভালো জানেন।

সূরা নাহল ১২৫।

এজন্যই নবীরা দাওয়াতি কাজে ইসলামের মূল্যবোধ বিরোধী কোন মাধ্যম ও পদ্ধতি ব্যবহার করেননি ইসলামী দাওয়াতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নবীগণ আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে দাওয়াতের ধারাক্রম শুরু করেছেন।

নবীগণ দাওয়াতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা তাদের যুগের বিবেচনায় অনেক বেশি আধুনিক এবং উন্নত ছিল।

তথ্যসূত্র:

1. সৎ কর্মের আদেশ, অসৎ কর্মের নিষেধ ইমাম আল গাজ্জালী রহমতুল্লাহ
2. দাওয়াত ও তাবলীগ উসুল ও আদব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রফি ওসমানী
3. আল কোরআন ও সুন্নায় দাওয়া ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
4. দাওয়াতের কুরআনী পদ্ধতি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবি
5. মুসলিম উম্মার পতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হলো সাঈদ আল আবুল হাসান আলী নদবী